বাগর্থ

বাগর্থ

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম. এ.,
মহাশয়ের ভূমিকা সংবলিত

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং আশুতোষ কলেজের
বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক
শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য, এম. এ., ডি. ফিল.
প্রণীত

প্রকাশক :
শ্রীসরোজনাথ সরকার, এম.এ., বি.এল.
কমলা বুক ডিপো
১৫নং বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা

মূল্য তিন টাকা

মুদ্রাকর :
শ্রীবিভূতিভূষণ বিশ্বাস
শ্রীপতি প্রেস
১৪, ডি. এল. রায় স্ট্রীট, কলিকাতা

ভূমিকা

বাঙ্গালা ভাষায় ভাষাতত্ত্ব এবং ভাষাগত সমস্যার সম্বন্ধে বই সংখ্যায় এত অল্প যে এ বিষয়ে দুই একখানি বই বাহির হইলে ভাষাতত্ত্বের অনুশীলক সকলের পক্ষেই আনন্দের কারণ হয়। এবং সে বইয়ে যদি যুক্তি-যুক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া ভাষাগত দুই চারিটি বৈশিষ্ট্যের বস্তুতান্ত্রিক আলোচনা এবং ভাষাগত সমস্যার যুক্তিসঙ্গত বিচার ও সমাধানের চেষ্টা দেখা যায় তাহা সোনায় সোহাগা হয়। বাঙ্গালা ভাষায় ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক অর্থাৎ যুক্তিতর্কানুমোদিত রীতিতে আলোচনামূলক গ্রন্থ খুবই কম, বোধ হয় এক আঙ্গুলে গণিয়া শেষ করা যায়। রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালীকে তাহার মাতৃভাষার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সার্থক ভাবে প্রথম শিক্ষা দিয়াছিলেন—তাঁহার রচিত কতকগুলি প্রবন্ধ, যেগুলি "শব্দতত্ত্ব" শীর্ষক ছোট একখানি গ্রন্থে সংকলিত হইয়া আছে সেগুলি, এখনও বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের আলোচনার পক্ষে মূল্যবান সাধনস্বরূপ বিদ্যমান। আচার্য রামেন্দ্রসুন্দরের "শব্দকথা"র কতকগুলি আলোচনা সম্বন্ধেও সে কথা বলা যায়। শ্রীযুক্ত সুকুমার সেনের "ভাষার ইতিবৃত্ত" ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে একটি 'শাস্ত্রসঙ্গত' পুস্তক। এই অবস্থায় বিচারবুদ্ধি এবং সত্যকার জিজ্ঞাসার অধিকারী হইয়া যদি কেহ ভাষাতত্ত্বের চর্চা করেন এবং সে বিষয়ে যুক্তি-যুক্ত কথা লেখেন তদ্দ্বারা তিনি মাতৃভাষায় বিজ্ঞানসম্পদের পরিবর্ধনে সহায়তা করেন।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিজনবিহারী ভট্টাচার্য রচিত এই বইখানি কতকগুলি প্রবন্ধের সংগ্রহ। এগুলিতে বাঙ্গালা ভাষার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আলোচিত হইয়াছে। প্রথম প্রবন্ধটির বিষয়বস্তু ধরিয়াই সমগ্র গ্রন্থখানির নামকরণ করা হইয়াছে। ইংরেজী Semantics শব্দের সংস্কৃত ও বাঙ্গালা প্রতিশব্দ হিসাবে বাগর্থবিজ্ঞান শব্দটি আমার বড় ভাল লাগিয়াছে—ইহার গঠনে কালিদাসের প্রযুক্ত বাগর্থ এই সুন্দর সমস্ত পদটির অতি সুষ্ঠু প্রয়োগ হইয়াছে। এই প্রবন্ধে বাগর্থবিজ্ঞানের মূলসূত্রগুলি সাধারণ পাঠকের পক্ষেও বোধগম্য করিয়া এবং উপযোগী বাঙ্গালা উদাহরণ দ্বারা বিশদ করিয়া লিখিত হইয়াছে। আপাতদৃষ্টিতে নীরস বিষয়ের বেশ সরস আলোচনা হইয়াছে।

"চলিত বাঙ্গালা ও তাহার বানান" প্রস্তাবে এই বানান বিষয়ে বাঙ্গালা ভাষায় যে ভীষণ অরাজকতা চলিতেছে সেদিকে সংখ্যা গণনা করিয়া অকাট্য যুক্তি-শলাকা দ্বারা তিনি আমাদের চক্ষু উন্মীলিত করিয়াছেন। ভাবিয়া স্তম্ভিত হইতে হয় যে আমাদের এই বঙ্গভাষা, "মোদের গরব-মোদের আশা" ইহার প্রতি শ্রদ্ধা আমাদের কি গভীর! এখানে যে যাহা খুশী তাহা করিতে পারে। "ক'রছে" এবং "চ'লল" এই দুই শব্দের যথাক্রমে চব্বিশটি চব্বিশটি করিয়া বানান বাঙ্গালায় প্রচলিত। এই সব হিসাব করিতেও যথেষ্ট পরিশ্রমের আবশ্যক হইয়াছে। ইহার সমাধান বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা করি করি করিয়াও করা হইল না। এবং কবে যে হইবে তাহাও জানিনা।

অন্য প্রবন্ধগুলি এইরূপ নানা আবশ্যক তথ্যের খনি এবং প্রত্যেকটি যথেষ্ট পরিমাণে চিন্তার খোরাক জোগাইতে সমর্থ। মোটের উপর বৈচিত্র্যে অনুসন্ধানে ও অনুশীলনে এবং যৌক্তিকতায় এই বইখানি বাঙ্গালা ভাষায় একটি নূতন ধরণের জিনিষ হইয়াছে। এই বই পাঠ করিয়া সকলেই উপকৃত হইবেন এবং আনন্দলাভ করিবেন। এবং আশা করি সুধী-সমাজে ইহার যথোচিত সমাদর হইবে।

দোলপূর্ণিমা
১৩৫৬/২০০৬ } শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
৪ মার্চ ১৯৫০

গ্রন্থকারের নিবেদন

বাগর্থের প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। সংকলিত প্রবন্ধগুলির বিষয়বস্তুর মধ্যে মিল আছে—আটটি প্রবন্ধই মোটামুটি ভাষাতত্ত্ববিষয়ক। 'মেদিনীপুরের প্রাদেশিক ভাষার উচ্চারণপ্রণালী' শীর্ষক প্রবন্ধটি সর্বাপেক্ষা পুরাতন। ইহার রচনাকাল ১৩৩৬, এবং ইহা প্রকাশিত হয় ১৩৩৭ সালের বৈশাখ মাসে মেদিনীপুরের মাধবী পত্রিকায়। গ্রিয়ার্সন সাহেব 'Linguistic Survey of India' গ্রন্থে যে উপভাষাকে দক্ষিণ-পশ্চিমা বাঙ্গালা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন এই প্রবন্ধের আলোচ্য ভাষা সেই দক্ষিণ-পশ্চিমা বাঙ্গালা। 'চলিত বাঙ্গালা ও তাহার বানান' প্রবন্ধটি রচিত হয় ১৩৪০ সালে কিন্তু প্রকাশিত হয় ১৩৪৩ সালের বৈশাখ সংখ্যা 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায়। রবীন্দ্রনাথ ১৯৩২ সালে যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপকপদ গ্রহণ করেন, তখন বর্তমান লেখককে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তাঁহার গবেষণাসহায়করূপে নিযুক্ত করা হয়। রবীন্দ্রনাথ ঐ সময়ে বাঙ্গালা বানানের সংস্কারে মনোযোগী হন এবং ঐ সম্পর্কে প্রাথমিক তথ্য সংকলনের ভার বর্তমান লেখকের হস্তে অর্পণ করেন, 'চলিত বাঙ্গালা ও তাহার বানান' তাহারই ফল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বাঙ্গালা বানান সংস্কারের যে উদ্‌যোগ হয়, এ প্রবন্ধ তাহার পূর্বেই রচিত এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে অর্পিত হয়। 'সর্বভারতীয় লিপি' শীর্ষক প্রবন্ধটি অধিক পুরাতন না হইলেও রচনাকালে ইহার যতখানি মূল্য ছিল আজ সম্ভবতঃ ততখানি নাই, কারণ আজ ভারতের সাধারণ ভাষা ও সাধারণ লিপি নির্ধারিত হইয়া গিয়াছে। তথাপি লিপি সম্পর্কে একদিন যে বিতণ্ডার সৃষ্টি হইয়াছিল এ প্রবন্ধে তাহার আলোচনা থাকায় আগামীকালের পাঠকের নিকট ইহা কিছুটা ঐতিহাসিক মূল্য বহন করিবে, এমন আশা করা যায়।

'বাগর্থবিজ্ঞান' প্রবন্ধের একটি উক্তির সমালোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ 'শব্দতত্ত্বের একটি তর্ক' শীর্ষক এক প্রবন্ধ (প্রবাসী, শ্রাবণ, ১৩৪৩)

লিখিয়া আমাকে যে গৌরব দান করিয়াছেন আজ সে কথা কৃতজ্ঞঅন্তরে স্মরণ করি।

আটটি প্রবন্ধের সাতটিই সাধুভাষায় লেখা, কেবল একটির ভাষা চলিত, উহা যেমন আছে তেমনই রাখিলাম বদলাইয়া সাধু করিলাম না।

মদীয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ভূমিকা লিখিয়া দিয়া এই গ্রন্থকে যে মর্যাদা দান করিয়াছেন সেজন্য নিজেকে চরিতার্থ বোধ করিতেছি। ইতি—

দোলপূর্ণিমা, ১৩৫৬ বিনীত
কলিকাতা গ্রন্থকার

সূচীপত্র

বাগর্থ

বাগর্থবিজ্ঞান

বাক্য ও অর্থের সম্পর্ক নিতান্ত ঘনিষ্ঠ জানিয়াই মহাকবি একদিন পার্বতী মহেশ্বরকে বাগর্থের সহিত উপমিত করিয়াছিলেন। কিন্তু ব্যবহারিক জগতে দেখিতে পাওয়া যায়, শব্দ ও অর্থের মধ্যে যে সম্বন্ধ তাহা সর্বদা স্থির নহে। বাক্য অনেক সময় অর্থকে অতিক্রম করে, অর্থও সব সময় বাক্যের বন্ধন মানিয়া চলে না।

পশ্চিমের শাব্দিকগণ বাগর্থ-সম্বন্ধের ভঙ্গুরতা দেখিয়া এ বিষয়ে চর্চা করিতেছেন। আমাদের দেশেও কিছু কিছু কাজ হইতেছে। কিন্তু বিষয়ের ব্যাপকতা ও গুরুত্বের অনুপাতে কাজের পরিমাণ অল্প।

ইংরাজিতে বিষয়টির নাম দেওয়া হইয়াছে Semantics বা Rhematology। এই দুইটি সংজ্ঞার মধ্যে প্রথমটিই অধিকতর প্রচলিত। গ্রীক্ ভাষায় rhema শব্দের অর্থ "উক্ত" অর্থাৎ "যাহা বলা হইয়াছে" এবং semaino শব্দের অর্থ "সূচিত করা"। এ দেশের শাব্দিকগণ এই বিজ্ঞানটিকে "শব্দার্থতত্ত্ব" এই বাঙ্গালা নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। "অর্থ-তত্ত্ব" শব্দটির দ্বারাই তো সহজে কাজ চলিতে পারে। তবে "শব্দার্থ" শব্দের ব্যবহার হয় কেন? কারণ, "অর্থতত্ত্বে"র অন্য অর্থও হইতে পারে এমন আশঙ্কা আছে। Economics সম্পর্কে "অর্থ" শব্দের বহুল প্রচলন আছে।[১] এই কারণে "শব্দ" কথাটিকে অনেকেই বাদ দিতে চান না।

কিন্তু "শব্দ" কথাটির প্রয়োগ সম্বন্ধে কিছু বলিবার আছে। প্রথমতঃ "শব্দ" কথাটির অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। আমরা যে অর্থে উহা ব্যবহার করিতে চাই তদপেক্ষা অনেক বেশী ভাব প্রকাশ করিবার ক্ষমতা উহার

১. যেমন, অর্থনীতি, অর্থশাস্ত্র।

আছে। ঠিক যে কারণে "অর্থ" শব্দের ব্যবহারে আপত্তি তোলা চলে সেই কারণেই "শব্দ" কথাটির ব্যবহারেও আপত্তি উঠান যায়। কিন্তু ইহাই প্রধান আপত্তি নয়। প্রধান আপত্তি এই যে "শব্দ" কথাটির মূল অর্থ ধ্বনি। আমরা শব্দকে speech অর্থে ব্যবহার করিতে চাই। অবশ্য সে অর্থেও উহার যথেষ্ট প্রয়োগ আছে এ কথা অস্বীকার করিতেছি না। অধিকতর উপযোগী শব্দ না পাইলে ইহাকেই সানন্দে গ্রহণ করিতাম।

আমাদের প্রস্তাব Semantics-এর বাঙ্গালা সংজ্ঞা "বাগর্থবিজ্ঞান" দেওয়া হউক। Semantics-এর অর্থ the science of meaning। প্রস্তাবিত পরিভাষায় এই অর্থ কি পরিমাণে রক্ষিত হইয়াছে দেখা যাউক।

পরিভাষারূপে ব্যবহৃত হইবার পক্ষে সকল শব্দের উপযোগিতা সমান নয়। বহুলব্যবহৃত শব্দ অপেক্ষা অনতিপ্রচলিত শব্দ পরিভাষার ক্ষেত্রে অধিক উপযোগী বলিয়া বিবেচিত হয়। বস্তুতঃ পরিভাষা একটি চিহ্নমাত্র। এই চিহ্ন যতদূর স্পষ্ট এবং স্বতন্ত্র হয় ততই ভাল। সে হিসাবে "বাগর্থ" শব্দটির উপযোগিতা "শব্দার্থ" অপেক্ষা অধিক। "শব্দার্থ" শব্দের বহুল প্রচলন আছে। বিচ্ছিন্ন ভাবেও "শব্দ" এবং "অর্থ"-এর ব্যবহার ভাষায় কিছু অল্প নয়। কিন্তু "বাগর্থ" শব্দের ব্যবহার অতি অল্পই। অধিকন্তু "বাক্" বলিয়া কোনো শব্দ বাঙ্গালায় পৃথক্ ভাবে ব্যবহৃতই হয় না।

পৃথক্ভাবে ব্যবহার না থাকিলেও সমাসবদ্ধ পদে বাক্ শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। "বাগ্‌বাদিনী" "বাগ্‌দেবী" আমাদের আরাধ্য দেবতা। সুতরাং বাক্‌শব্দ একেবারে অপরিচিত নয়।

বাক্ শব্দটি আমাদের অভিপ্রেত অর্থ সুন্দররূপে প্রকাশিত করিতে পারে। সংস্কৃত ভাষায় ঐ অর্থেই বাক্ শব্দের যথেষ্ট প্রয়োগ আছে।[২]

পরিভাষা একটি সংজ্ঞা মাত্র। নিরুক্তি ব্যতীত কোনো সংজ্ঞাই সম্পূর্ণ নয়। Rhematology-ই বলি আর Semantics-ই বলি, ব্যাখ্যা না দিলে কোনো নামই অভিপ্রেত ভাবটি সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করিতে পারে না। তবে যে সংজ্ঞাটি বক্তার অল্পতম আয়াসে অভিপ্রেত ভাবের অধিকতম অংশ প্রকাশ করিবার

২. বাগর্থাবিবসম্পৃক্তৌ বাগর্থপ্রতিপত্তয়ে।
জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্বতীপরমেশ্বরৌ। —রঘুবংশম্
যথা স্ত্রীণাং তথা বাচাং সাধুত্বে দুর্জনো জনঃ। —উত্তররামচরিতম্

ক্ষমতা রাখে পরিভাষা হিসাবে তাহারই যোগ্যতা সকলের অপেক্ষা বেশী। সম্ভবতঃ এই কারণেই Semantics কথাটি Rhematology অপেক্ষা বেশী প্রচলিত হইয়াছে। "বাগর্থ" শব্দের মধ্যে rhema ও semaino এই টি শব্দের অর্থই অংশাঅংশি ভাবে বজায় আছে। সুতরাং এই দুইটি পরিভাষার যে কোনোটি অপেক্ষা বাঙ্গালা পরিভাষাটি অধিকতর অর্থ বহন করিবে। সে কারণেও প্রস্তাবিত শব্দটি গ্রহণীয়।

শ্রুতিমাধুর্য পরিভাষার অন্যতম গুণ হওয়া আবশ্যক। যে সংজ্ঞা দুরুচ্চার্য এবং শ্রুতিকটু তাহা সহজে চলে না। "শব্দার্থতত্ত্ব" অপেক্ষা "বাগর্থবিজ্ঞান" শুনিতে বোধ হয় ভালই লাগিবে। "তত্ত্বে"র পরিবর্তে "বিজ্ঞান" শব্দটি প্রয়োগ করিলে অনুপ্রাসের দ্বারা সংজ্ঞাটিকে সুশ্রাব্য করিয়া তুলিবে।

সর্বশেষে বক্তব্য এই যে, "বাগর্থ" শব্দটিকে কালিদাস যে অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন আমরা প্রায় সেই অর্থেই ইহার প্রয়োগ করিতেছি। "শব্দার্থ" দ্বারা সে কাজ সুষ্ঠুতররূপে নির্বাহিত হইবার সম্ভাবনা থাকিলে কালিদাস "বাগর্থ" শব্দটি নির্বাচন করিতেন না। একটি মহাকাব্যের প্রথম শ্লোকে মহাকবি যে শব্দ বসাইয়াছেন তাহা যতদূর সম্ভব ছিদ্রহীন এবং সমালোচনার অতীত করা যায় সে বিষয়ে চেষ্টার ত্রুটি নিশ্চয় করেন নাই। ভবভূতির ন্যায় পণ্ডিতও তাঁহারই অনুবর্তন করিয়াছেন।

এখন এই সংজ্ঞাটির যোগ্যতা কতদূর পণ্ডিতেরা তাহার বিচার করিবেন।

অ র্থে র প রি ব র্ত ন শী ল তা

কোনো ভাষার কোনো শব্দ চিরকাল একই অর্থ বহন করে না। নানা কারণে শব্দের অর্থ পরিবর্তিত হইতে থাকে। ভাষার মূল সূত্র জানিলে এই পরিবর্তনের ধারাটির সন্ধান পাওয়া যায়। [৩]

ভাষার সহিত মানবমনের সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। ভাষা-বিজ্ঞান অধ্যয়নের জন্য মনোবিজ্ঞানের সাহায্য এই কারণেই একান্ত আবশ্যক। কোনো জাতির সাহিত্য ও ভাষার মধ্য দিয়া তাহার ইতিহাস উদ্ধার করা যেমন অনেকটা সম্ভব হয় তেমনি তাহার সংস্কৃতি ও সভ্যতার পরিচয় জানা থাকিলে সেই

৩, শ্রীহেমন্তকুমার সরকার লিখিত Intellectual Laws of Language and the Bengali Semantics শীর্ষক প্রবন্ধটি এই সম্পর্কে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

জাতির ভাষা অধ্যয়নও সহজ হয়। একটি দৃষ্টান্তের দ্বারা বক্তব্যটি পরিষ্কার করিতে চেষ্টা করি।

ঋগ্‌বেদে "অসুর" শব্দটি প্রাণদ অর্থে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। ইন্দ্র বরুণ, অগ্নি, সবিতৃ, রুদ্র প্রভৃতি দেবতা অসুর বিশেষণে সম্মানিত হইয়াছেন। কখনও কখনও দেবতাগণ অর্থে বহুবচনে অসুর শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। এতদ্‌ব্যতীত আরও অনেক স্থলে ভাল অর্থে অসুর শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। অধুনা-প্রচলিত অর্থেও অসুর শব্দ ঋগ্‌বেদে ব্যবহৃত হইয়াছে বটে কিন্তু তাহা দুই এক স্থলে মাত্র। কিন্তু ঋগ্‌বেদের দশম মণ্ডলে এবং অথর্ববেদে বর্তমান অর্থে অসুর শব্দের বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। ব্রাহ্মণ গ্রন্থে দেব এবং অসুরের মধ্যে দ্বন্দ্ব বর্ণিত হইয়াছে। এখানেও অসুর পুরাতন অর্থ পরিত্যাগ করিয়াছে।

পৌরাণিক যুগে অসুর শব্দ পুরাতন অর্থ সম্পূর্ণরূপে বর্জন করিয়া আধুনিক অর্থ (দানব বা রাক্ষস) গ্রহণ করিয়াছে দেখিতে পাই। ইহার ফলে একটি নূতন শব্দ জন্মলাভ করিল। এই নূতন শব্দটি হইতেছে "সুর"। অসুর এবং দেবের মধ্যে নিয়ত যে যুদ্ধ হইতে লাগিল তাহার ফলে অসুরের অর্থ হইল দেবেতর। অসুর শব্দের প্রথম বর্ণ 'অ' থাকায় এই অর্থ আরও দৃঢ় হইল। এই 'অ' কে নঞ্‌ সম্ভূত ধরিয়া 'ন সুরঃ' বাক্যে অসুর শব্দের সমাস নিষ্পন্ন হইয়াছে এই অনুমানে "সুর" শব্দকে বিচ্ছিন্ন করা হইল। এইরূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া সুর শব্দ দেব অর্থে ব্যবহৃত হইতে লাগিল। 'অসু' (যাহার অর্থ প্রাণ) হইতে যে অসুর শব্দের উৎপত্তি তাহা লোকের মন হইতে একরূপ মুছিয়া গেল।

প্রাচীন জরথুশ্‌ত্রীয় ধর্মের সহিত যাঁহাদের পরিচয় আছে তাঁহাদের পক্ষে অসুর শব্দের অর্থান্তরলাভের কারণ উপলব্ধি করা বিশেষ কঠিন হইবে না। পারস্যের মজ্‌দা-উপাসক এবং ভারতের বৈদিক আর্যগণের মধ্যে যে যোগ ছিল তাহার প্রমাণ এখন প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। বেদ এবং অবেস্তার ভাষা এবং বিষয়বস্তুর মধ্যে যথেষ্ট মিল আছে। এই মিলই উভয় জাতির মধ্যে সংযোগের নিদর্শন। মজ্‌দা-উপাসকগণের প্রধান দেবতা অহুর-মজ্‌দা বা অহুর। অবেস্তা "অহুর" এবং সংস্কৃত "অসুর" অভিন্ন। সেই জন্যই ঋগ্‌বেদের প্রাচীনতর অংশে "অসুর" দেবতা অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে।

পরবর্তী কালে উভয় জাতির মধ্যে একটা বিরোধ উপস্থিত হইল। সেই বিরোধ ক্রমশঃ ঘৃণা এবং বিদ্বেষে পর্যবসিত হইল। তাহার ফলেই ভারতীয় আর্যগণ পারসীক আর্যদের দেবতাকে নিজেদের ধর্মশাস্ত্রে ক্রমশঃ দেবতা বলিয়া অস্বীকার করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে নঞর্থক অসুর (দেবতা নয়) ক্রমশঃ সদর্থক রাক্ষসে পরিণত হইল।[৪]

"অসুর" শব্দের অর্থ হইল রাক্ষস। আবার অন্যদিকে পারসীকগণ হিন্দুর "দেব" (অবেস্তা দএব)-কে তাহাদের ধর্মশাস্ত্রে দানব অর্থ দিয়া প্রতিশোধ লইল। অবেস্তায় দেব শব্দের অর্থ দৈত্য বা রাক্ষস।

উল্লিখিত উদাহরণ দুইটির দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায় যে শব্দের অর্থ স্থান কাল পাত্রাদি অনুসারে পরিবর্তন লাভ করে।

প রি ব র্ত ন শী ল তা অ নি য় ত

যে কারণে এক শব্দের অর্থ পরিবর্তিত হইল ঠিক সেই কারণেই যে সকল শব্দের অর্থ পরিবর্তিত হইবে এমন কোনো মানে নাই। পারসীক "অসুর" শব্দ বেদে প্রথমে ভাল এবং পরে মন্দ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়াই যে বৈদিক "দেব" শব্দও অবেস্তায় প্রথমে ভাল এবং পরে বিপরীত অর্থে প্রযুক্ত হইবে এমন নয়। বস্তুতঃ তাহা হয়ও নাই। অবেস্তার "দেব" শব্দ পূর্বাপর কেবল "দৈত্য" অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। দেবতা অর্থে কোথাও ইহার প্রয়োগ দেখা যায় না। "হস্ত" শব্দ হাতীর শুঁড় অর্থে প্রচলিত হইয়াছে, সুতরাং "শুণ্ড" শব্দ মানুষের হাত অর্থে কেন ব্যবহৃত হইবে না বলিয়া তর্ক করিলে চলিবে না। মানুষের মন যন্ত্র নয় এবং তাহার কাজ-কর্মও যন্ত্রের মত সুনির্দিষ্ট নিয়মে চলে না। ভাষাবিজ্ঞান নিয়ম প্রণয়ন করিয়া ভাষা তৈয়ার করে না, ভাষার গতিপথ অনুসরণ করিয়া কোন নিয়মে তাহার কাজ চলিতেছে তাহাই অনুসন্ধান করে মাত্র।

৪. এই সম্পর্কে "বিধবা" শব্দের উল্লেখ সম্ভবতঃ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। বৈয়াকরণরা বিধবা শব্দকে নঞর্থক কল্পনা করিয়া "ধব" এই নূতন শব্দটি সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহার ফলে "সধবা" শব্দের উৎপত্তি হইল। রবীন্দ্রনাথ বহুবামিকতা অর্থে "বৈধব্য" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। কার্যতঃ শব্দটি নঞর্থক নয়। ইহার মূল এবং ইংরাজী widow শব্দের মূল অভিন্ন। পুরাতন ইংরাজী widewe, ডাচ্ weduwe, জার্মান wittwe, লাটিন viduus এবং গ্রীক eitheos প্রভৃতি শব্দ হইতেও সে পরিচয় পাওয়া যায়।

ফারসী "খুন" শব্দের অর্থ রক্ত। কিন্তু বাঙ্গালায় "খুন" শব্দ হত্যা অর্থেই প্রযুক্ত হয়। তথাকথিত মাদ্রাসা-বাঙ্গালার প্রচারক এবং গজল গানের রচয়িতারা "খুন" শব্দকে রক্ত অর্থে যতই ব্যবহার করুন না কেন অদূর ভবিষ্যতে সাধু বাঙ্গালায় ঐ অর্থে ইহার ব্যবহার হইবে বলিয়া মনে হয় না; অন্ততঃ এখনও পর্যন্ত হয় নাই। কেন হইল না বলিয়া কেহ যদি আক্ষেপ করেন তো সে আক্ষেপ নিষ্ফল।

কোনো শব্দের অর্থ কেন এরূপ হইল তাহা বলিয়া দেওয়াই শব্দবিজ্ঞানের কাজ। কোনো বিশেষ শব্দের আকৃতি বা অর্থ যদি স্বাভাবিক অবস্থার প্রতিকূল হয় শব্দতাত্ত্বিকগণ হয়তো তাহার কারণও প্রদর্শন করিতে পারেন। কিন্তু ঠিক অনুরূপ অবস্থায় অনুরূপ শব্দের আকৃতি ও প্রকৃতি পরিবর্তিত হইবে কি না একথা তাঁহারা সুনিশ্চিতরূপে বলিতে পারেন না। কোনো ভাষাই সম্পূর্ণ বাঁধাধরা নিয়মে কাজ করে না; করিলে ব্যাকরণে নিপাতন বা আর্ষ প্রয়োগ বলিয়া কিছু থাকিত না।

বা গ র্থ ও চি ন্তা ধা রা

জাতির সংস্কৃতি, সভ্যতা, রুচি ও চিন্তাধারার সহিত ভাষার যোগ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। "পঙ্কজ" শব্দটি প্রথমে পঙ্ক হইতে জাত এই অর্থে বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হয়। পরে তাহা পুষ্পবিশেষের বিশেষণরূপেই বহুলভাবে প্রযুক্ত হইতে থাকে। ক্রমশঃ পুষ্পটি উহ্য হইয়া যায় কেবল বিশেষণই তাহার কাজ চালাইয়া লয়। এইভাবে "পঙ্কজ" পদ্ম অর্থে চলিত হইয়া গেল। কবির কাব্যে, সাহিত্যিকের রস-রচনায়, নাট্যকারের নাটকে শামুক বা শুগ্‌লি অপেক্ষা পদ্মেরই আদর এবং প্রয়োগ অধিক, কাজেই উহারা পঙ্কজাত হইলেও পঙ্কজ হইল না।

আন্নাকালী,[৫] চায়না[৬] (চাই না), ক্ষান্তমণি[৭] প্রভৃতি শব্দ নামরূপে ব্যবহৃত হইবার মূলে যে কারণটি নিহিত আছে বঙ্গবাসিমাত্রই তাহা জানেন। সামাজিক অবস্থার প্রতিচ্ছায়া এই শব্দগুলির উপর কি রকম প্রতিফলিত

৫. আন্নাকালী। আর+না+কালী, হে মা কালী, আর (কন্যা দিও) না।

৬. চায়না। চাই+না; 'Not-wanted'।

৭. ক্ষান্তমণি। ক্ষান্ত (বিরত হও অর্থাৎ কন্যাজন্ম তোমার আগমনের সহিতই যেন শেষ হয়), মণি আদরে।

হইয়াছে তাহা সুস্পষ্টরূপে দেখা যায়। কৌলীন্যপ্রথার যুগে বহুকন্যার পিতা হওয়ার মত দুঃখ আর কিছু ছিল না। কুল গিয়াছে কিন্তু কৌলীন্য এখনও যায় নাই। তাই এখনও আমরা নবজাত দুহিতাকে "চাইনা" বলিয়া স্বাগত সম্ভাষণ করি।

আবার কেনারাম[৮], ফেলারাম[৯], তিনকড়ি[১০], এককড়ি[১০] প্রভৃতি শব্দ এবং উহাদের অর্থ পর্যালোচনা করিলে সমাজের আর একটা দিক প্রতিফলিত হয়। বন্ধ্যা বা মৃতবৎসা নারীর নিকটে পুত্রের জন্ম ও দীর্ঘজীবন যে কিরূপ কামনীয় এই শব্দগুলি তাহারই পরিচয় দেয়। যাহার কোনো সন্তান নাই বা যাহার সন্তান বাঁচে না, একটি কন্যা আসিলেও সে অনাদর করিতে ভরসা পায় না। সেই জন্য কন্যার নামও থাকমণি[১১] দেওয়া হয়। এইসব নামের মধ্যে একটি অন্ধসংস্কারের ইতিহাসও প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। কাঙালী[১২] মেথরা[১৩], গুয়ে[১৪] প্রভৃতি নামও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

৮. কেনারাম। মৃতবৎসা রমণীর বিশ্বাস তাহারই পাপের ফলে সন্তান বাঁচে না। তিনি যদি স্বীয় সন্তানের স্বত্ব ত্যাগ করিয়া দেন তাহা হইলে বিধাতা মাতার পাপে সন্তানকে আর কাড়িয়া লইবেন না। সেইজন্য পুত্রের জন্মকালে ধাত্রীর নিকটে মাতা নবজাত সন্তানকে দান করিয়া দিতেন। পরে কিছু অর্থ দিয়া ধাত্রীর নিকট হইতে তাহাকে ক্রয় করিয়া লইতেন। ইহাতে প্রসূতি ও সন্তানের মধ্যে যে মাতাপুত্র সম্বন্ধ ছিল তাহা ছিন্ন করিয়া দেওয়া হইল এবং আত্মজ পুত্রকে জননী পুনরায় পালিত পুত্ররূপে গ্রহণ করিলেন। কেনারামের অর্থ—যে সন্তানকে ক্রয় করা হইয়াছে। 'কেনারাম' নাম দেখিয়া বিধাতা বুঝিবেন, এ সন্তান ঐ রমণীর নিজের পুত্র নহে, সুতরাং তাহাকে তিনি ত্যাগ করিবেন। নামের মধ্য দিয়া বিধাতাকে ফাঁকি দেওয়ার কি চমৎকার চেষ্টা!

৯. ফেলারাম। দুর্ভাগিনী রমণীর ধারণা মূল্যবান্ বস্তুর উপরই ভগবানের দৃষ্টি পড়ে। যাহাকে অধিক ভালবাসি ভগবান্ তাহাকেই অকালে ছিনাইয়া লন। এইজন্য সন্তানকে তুচ্ছার্থক নাম দেওয়ার রীতি। ফেলারাম শব্দের অর্থ যাহাকে ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

১০. তিনকড়ি। তিন কড়া মূল্য দিয়া যাহাকে ধাত্রীর নিকট হইতে ক্রয় করা হইয়াছে। এককড়ি। ঐরূপ।

১১. থাকমণি। মায়ের ধারণা তাঁহারই আদরের অভাবে সন্তান থাকে না। তাই তাহাকে আদর করিয়া নাম দেওয়া হইল 'থাক' অর্থাৎ আর যাইও না।

১২. কাঙালী। অর্থ ভিখারী, দুঃখী।

১৩. মেথরা। অর্থ মেথর, ঝাড়ুদার।

১৪. গুয়ে। গু + ইয়া = গুইয়া, গুয়ে।

উপরিউক্ত তিনটির অর্থ ৮ এর অনুরূপ।

বিদেশ যাত্রাকালে আমরা যখন গুরুজনদের প্রণাম করিয়া যাত্রা করি তখন তাঁহারা "এস" বলিয়া বিদায় দেন। এই "এস" শব্দ যাও অর্থে ব্যবহৃত হয়। প্রাচীন বাঙ্গালা "মেলানি" শব্দটিও ঐরূপ। এগুলিও সামাজিক অবস্থা এবং সমাজের চিন্তাধারার পরিচয় দেয়।

য থা কা ল

কোনো বিশেষ শব্দ বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হইবার মূলে যে সকল কারণ ক্রিয়া করে সময় তাহাদের অন্যতম। আমরা বন্ধুজনবিচ্ছেদকে চিরকালই অশুভ মনে করি। তাহার কারণও সুস্পষ্ট। প্রাচীন কালে যান-বাহনাদির অসুবিধা এবং দস্যুতস্করের ভয়বশতঃ লোকে একবার বিদেশ যাত্রা করিলে আত্মীয়স্বজন তাহার প্রত্যাগমনের আশা একরূপ ছাড়িয়া দিতেন। কিন্তু ছাড়িয়া দিব বলিলেই তো মা পুত্রের আশা স্ত্রী স্বামীর আশা আপনাপন হৃদয় হইতে একেবারে নির্মূল করিয়া দিতে পারেন না। পাইব না—এই আশঙ্কা হয় বলিয়াই পাইবার কামনা আরও বাড়িয়া যায়। এইরূপ যখন মনের অবস্থা তখন দেখা গেল লোকে প্রিয়জনের বিদায়কালে বারংবার ফিরিয়া আসিবার জন্য অনুরোধ করিতেছে। সেই ফিরিয়া আসিবার জন্য যে অনুরোধ তাহারই বাড়াবাড়িতে যাইবার অনুমতি চাপা পড়িয়া গেল। লোকে দেখিল যাইবার কথা তো কেহ উচ্চারণ করে না। যেখানে "যাও" বলিবার কথা, সেখানে "এস" বলাটাই রীতি হইয়া গেল। এই রীতি প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া না আসিলে আজিকার দিনে হয়তো জন্মলাভ করিত না। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, নূতন শব্দ বা পুরাতন শব্দের নূতন অর্থ উৎপত্তির মূলে উপযুক্ত কালের অনেকখানি কর্তৃত্ব আছে।

বা গ র্থ ও ব্যা ক র ণ

পূর্বেই বলিয়াছি জীবন্ত ভাষা সর্বথা এবং সর্বদা ব্যাকরণ মানিয়া চলে না। যে ভাষা অন্ধের মত ব্যাকরণকে সর্বথা অনুসরণ করিয়া চলে, সে ভাষার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। সংস্কৃতই তাহার প্রমাণ। অথচ প্রাকৃত ভাষা যুগে যুগে পরিবর্তিত হইয়া আজ পর্যন্ত সজীবতা রক্ষা করিয়া চলিতেছে।

প্রতিষ্ঠাবান লেখকগণ ব্যাকরণের অননুমোদিত পদও ভাষায় ব্যবহার করেন। তথাকথিত অশুদ্ধ পদও বিশেষ বিশেষ অর্থে চলিত হইয়া যায়। বাঙ্গালায় মাইকেল মধুসূদন দত্ত বরুণ-পত্নী অর্থে "বারুণী" ব্যবহার করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ গাহিব অর্থে গাইব ব্যবহার না করিয়া কোনো কোনো স্থলে "গাব"[১৫] লিখিয়াছেন। শ্রীযুক্ত দিলীপ রায় গাইতে-র স্থলে "গেতে"[১৬] লিখিয়াছেন। শরৎচন্দ্র লইয়াছি স্থলে "নিয়াছি"[১৭] প্রয়োগ করিয়াছেন। উল্লিখিত পদগুলি অধুনা-প্রচলিত ব্যাকরণের নিয়মানুসারে অচল হইলেও, পরবর্তীকালে যে ব্যাকরণ রচিত হইবে তাহাতে শুদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হইবে। এই কারণেই কবি বলিয়াছেন:

লৌকিকানাং হি সাধূনামর্থং বাগনুবর্ততে।
ঋষীণাং পুনরাদ্যানাং বাচমর্থোঽনুধাবতি ॥

অর্থ - প রি ব র্ত ন

মনের সহিত বাক্যের সম্বন্ধ যে কিরূপ প্রগাঢ় তাহা জানিলে অর্থ পরিবর্তনের বিভিন্ন প্রণালীর অনুসরণ করা সহজ হইবে। সেই জন্যই ঐ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা হইল। আমরা দেখিলাম দেশ কাল পাত্র এবং পারিপার্শ্বিক অন্যান্য অবস্থা মনের উপর যেরূপ প্রভাব বিস্তার করে,

১৫. গাব। ভবিষ্যৎকালে উত্তম পুরুষে গাহ্‌ ধাতুর সাধু ভাষায় রূপ হইবে 'গাহিব', চলিত ভাষায় রূপ হইবে 'গাইব'। মূল ধাতুর হ চলিত ভাষায় লোপ পাইয়া যায়, কিন্তু ই থাকে। ঐরূপ নাহ্‌ হইতে 'নাইব'—সহ্‌ হইতে 'সইব' ইত্যাদি। কিন্তু মূল ধাতুতে হ না থাকিলে অন্যরূপ হইবে। যেমন, পা ধাতু হইতে 'পাব', যা ধাতু হইতে 'যাব' ইত্যাদি। 'যাব' 'পাব' প্রভৃতি পদের সাদৃশ্যে 'গাব' 'নাব' এইরূপ লিখিলে চলিত ব্যাকরণের বিচারে ভুল বলিয়া গণ্য হইবে।

১৬. গেতে। ব্যাকরণ অনুসারে 'গাইতে' হওয়া উচিত।

১৭. লওয়া ধাতু সাধুভাষার ধাতু, ইহার চলিত রূপ নি। -ইয়াছি সাধুভাষার বিভক্তি, উহার চলিত রূপ -এছি। সুতরাং সাধু ল+ইয়াছি=লইয়াছি এবং চলিত ভাষায় নি+এছি=নিয়েছি। নিয়াছি শব্দে চলিত ধাতুর সহিত সাধু বিভক্তি যোগ করা হইয়াছে। ইহা ব্যাকরণসম্মত প্রয়োগ নহে। আবার কেহ যদি সাধুভাষায় ধাতুর সহিত চলিত ভাষার বিভক্তি যোগ করিয়া 'লয়েছি' লিখেন, তাহাও গদ্য-ব্যাকরণের নিয়মে শুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হইবে না।

শব্দার্থও সেইভাবে পরিবর্তিত হইতে থাকে। অর্থ-পরিবর্তনের মোটামুটি তিনটি ধারা আছে: ১. সম্প্রসারণ, ২. সংকোচন, এবং ৩. আরোপণ।

সম্প্রসারণ

যে শব্দের যখন উৎপত্তি হয় তখন তাহার একটি স্বতন্ত্র অর্থ থাকে। সেই শব্দটি তখন বিশেষ কোনো ব্যক্তি বস্তু বা ভাব প্রকাশ করিবার জন্ত নিয়োজিত হয়। কালক্রমে দেখা যায় সেই শব্দ পুরাতন অর্থের বন্ধন না মানিয়া সঙ্গে সঙ্গে আরও নূতন অর্থ অধিকার করিয়া বসে। ইহাকেই অর্থ-সম্প্রসারণ বলা যায়।

কপাল বলিতে ললাট বুঝায়। ঐ অর্থেই প্রথমে কপাল শব্দের ব্যবহার হইলেও পরে "অদৃষ্ট" এই দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ করিয়াছে। হিন্দুদের সংস্কার এই যে মানুষের জীবনে যাহা যাহা ঘটিবে বিধাতাপুরুষ তাহা জীবনের প্রারম্ভেই ললাটে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন। এই সংস্কারবশতই তাহারা ললাটলিপি বা কপালের লেখা বলিতে অদৃষ্টকেই বুঝিত। পরে লিপি বা লেখা উঠিয়া গেল। শুধু ললাট এবং কপাল অদৃষ্ট অর্থে প্রযুক্ত হইতে লাগিল। "এঁঠো" সংস্কৃত আমৃষ্ট হইতে আগত। আমৃষ্টের অর্থ ঘাঁটা বা মাখা, তাহা হইতে অর্থ হইল ভুক্তাবশিষ্ট বা উচ্ছিষ্ট। ক্রমশঃ ভোজনের পর অধৌত পাত্রাদিও "এঁঠো"র পর্যায়ে পড়িল। যেমন, এঁঠো বাসন, এঁঠো হাত। বাঙ্গালা দেশে এঁঠো শব্দ কেবল উচ্ছিষ্টার্থক নয়। ইহার আর একটি অর্থ আছে যাহাকে সকড়ি বলা হয়। এখানেও এঁঠো শব্দের অর্থে সম্প্রসারণ ঘটিয়াছে। বাঙ্গালা "পরশু" শব্দ অর্থ-সম্প্রসারণের আর একটি নিদর্শন। এই শব্দ সংস্কৃত পরশ্ব (যাহার অর্থ অগামী কল্যের পর দিবস) হইতে আগত। কিন্তু বাঙ্গালায় ইহার অর্থ শুধু ভবিষ্যদ্‌বাচী নয় অতীতবাচকও। আমরা "পরশু" বলিতে যেমন আগামী কালের পরদিবস বুঝি তেমনই গত কালের পূর্বদিবসও বুঝিয়া থাকি। হিন্দী "পরসোঁ" শব্দেও ঠিক বাঙ্গালার ন্তায় অর্থসম্প্রসারণ ঘটিয়াছে। ওড়িয়াতেও পরশু শব্দের অর্থ বাঙ্গালার অনুরূপ। "বোতল" ও "গেলাস" আধারবাচক হইলেও সময়ে সময়ে আধেয়কেও বুঝাইয়া থাকে।

নামবাচক শব্দ বস্তু অর্থে ব্যবহৃত হইলে অর্থের বিস্তার ঘটে। ছেলেরা ক্ষুধাভাবে হর্লিক খায়। ব্যাটাভিয়া দেশে উৎপন্ন বলিয়া কলাবিশেষের নাম বাতাবি। ডি. গুপ্ত ব্যক্তিবিশেষের নাম, তাহা হইতে একটি প্রসিদ্ধ জরের ঔষধ ঐ নাম পাইয়াছে। গঙ্গা নদীবিশেষের নাম, কিন্তু গঙ্গার অপভ্রংশ গাঙ্গ বা গাঙ শব্দের অর্থও নদী।

নঞ্‌-এর অর্থপরিবর্তন

শুধু নঞ্‌ শব্দের অর্থ কত রকম পরিবর্তন গ্রহণ করে, তাহা লক্ষ্য করিলেই শব্দার্থ-সম্প্রসারণের সুন্দর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। নঞ্‌-এর মূল অর্থ না। কিন্তু ক্রমশঃ ঐ শব্দ অভাব, অল্পতা, অন্যত্ব প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইতে লাগিল। কখনও কখনও নঞ্‌-এর স্বার্থে প্রয়োগ হইয়া থাকে। জোরের সহিত 'না' বলায় হাঁ সূচনা করে। দুই নেতিবাচক বাক্য বা শব্দ একত্র মিলিত হইলে সদর্থক হয়—ব্যাকরণের এই যে নিয়ম, ইহার মূলেও বোধ হয় উপরিউক্ত কারণ বর্তমান।

শব্দের সহিত নঞর্থক উপসর্গ এবং প্রত্যয় প্রভৃতির যোগে নেতিবাচক শব্দেরই প্রথম সৃষ্টি হয়। আদি নাই যাহার সে "অনাদি", সীমা নাই যাহার সে "অসীম", তল নাই যাহার সে "অতল", ভাব অর্থাৎ সত্তা নাই যাহার তাহার নাম "অভাব"। এইরূপ জন নাই যেস্থানে তাহা "নির্জন" বা 'জনহীন", যাহা কম্পিত হয় না তাহা "নিষ্কম্প"। কড়ি নাই যাহার সে "নিকড়ে", ঘৃণা নাই যাহার সে "নিঘিন্নে"। কিন্তু নঞ্‌-এর অর্থ চিরকাল না রহিল না; ধীরে ধীরে তাহার অর্থ পরিবর্তিত হইতে লাগিল।

অল্পতা

"অভাব" শব্দটির কথাই প্রথমে ধরা যাউক। ইহার মূল অর্থ "না থাকার ভাব"। যেমন, আলোর অভাব অন্ধকার। কিন্তু এই অর্থ বদলাইয়া অভাবের গৌণ অর্থ হইল "অল্পতা"। যেমন অন্নের অভাব, ভিক্ষার অভাব, খাদ্যের অভাব ইত্যাদি। আবার তাহা হইতে অভাব শব্দ দারিদ্র্য অর্থেও প্রযুক্ত হইতে লাগিল। যেমন, অভাবে স্বভাব নষ্ট। "অবুধি", "অগেয়ানী", "অবুঝ" প্রভৃতি শব্দের অ অল্পার্থে প্রযুক্ত।

অ স্বা স্থ্য

নঞ্ অস্বার্থেও ব্যবহৃত হয়। "অসুখ" বলিলে বাঙ্গালায় শুধু সুখের অভাব বুঝায় না। সুখের অভাব যদি বা বুঝায় তাহা গৌণতঃ। কিন্তু প্রধান অর্থ হয় "রোগ"। এইরূপ "অসিত" অর্থে যাহা সিত বা শ্বেতবর্ণ নহে তাহাই বুঝাইবে এমন নয়। "অসিত" শব্দের অর্থ কৃষ্ণবর্ণ। যথা,— অসিতবরণী শ্যামা। "অলৌকিক" ও "অপার্থিব" শব্দের অর্থ "স্বর্গীয়"।

বৈ প রী ত্য

নঞর্থক শব্দ ও প্রত্যয়াদি যে শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয় তাহাকে অনেক সময় বিপরীতার্থক করিয়া তুলে। যেমন, "অমিত্র"। যে মিত্র নয় সে যে শত্রু হইবেই এমন কোনো কথা নাই তথাপি অমিত্র বলিলে কেবল শত্রুকেই বুঝায়। অসুর বলিলে কেবল সুরবিরোধী রাক্ষস বুঝায়। এখানে নঞ্ বিপরীতার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে।

অ প্রা শ স্ত্য

কদর্থে নঞ্ প্রয়োগের অনেক উদাহরণ বাঙ্গালায় আছে। "অঘাট" বা "আঘাটা" বলিলে খারাপ ঘাট বুঝায়। "আকাল" শব্দের অর্থও অপ্রশস্ত কাল। "অকাজ" শব্দ কুকাজ অর্থে প্রযুক্ত হয়। "অমানুষ" "অসময়" "অপথ" প্রভৃতি শব্দের "অ"-ও নেতিবাচক নয়, মন্দবাচক। রবীন্দ্র নাথের একটি ছত্র মনে পড়িতেছে :

"অকারণে অকাজ লয়ে ঘাড়ে
অসময়ে অপথ দিয়ে যান।"

আবার ভারতচন্দ্রের একটি ছত্র উদ্ধৃত করি :

"যত করে মুসলমান সকলি অকাজ।"

"অব্রাহ্মণ" বলিলে অপকৃষ্ট ব্রাহ্মণ বুঝায়। "অকথ্য" শব্দেও নঞের কদর্থ দেখা যায়।

নি ষে ধা র্থ ক

মদ্য "অপেয়" বলিলে পেয় নয় এরূপ মনে করিবার কারণ নাই। আবার মদ্য পেয় বলিলেও সুরাপানের যে অপরাধ তাহার গুরুত্ব কমিয়া যায়।

এখানে সেইজন্য কারণে "অপেয়" শব্দ নিষিদ্ধ পেয় এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছে। গোমাংস "অভক্ষ্য" বলিলেও নিষিদ্ধ ভক্ষ্যই বুঝায়।

স্বা র্থ

খাদ্য পরিবেষণের সময় আমরা যে "না না" বলি তাহার অন্তর্নিহিত অর্থ কিন্তু সব সময় 'না' নয়। সেইজন্য ব্যাগ্রকম্পনের পূর্ব পর্যন্ত ভোক্তার অন্নপাত্রে আহার্য দিবার লৌকিক আদেশ এদেশে প্রচলিত। এইরূপে নঞর্থক শব্দ, প্রত্যয়, উপসর্গ প্রভৃতির নঞ্ অর্থ সম্পূর্ণ অপসারিত হইয়া যায়। প্রাচীন বাঙ্গালায় এরূপ শব্দের দৃষ্টান্ত বিরল নহে। "আঘোর" পাপে তোর বেআপিল গা" (কৃষ্ণকীর্তন) এখানে "আঘোর" শব্দের অর্থ ঘোর। "নাবালক" (আরবী নাবালিগ্) শব্দের "না" কেও স্বার্থে যুক্ত বলিয়া অনেকে মনে করেন।

আছুক লাভ মোর মূলত আফার (কৃষ্ণকীর্তন)। "মূলত আকার" ইহার অর্থ "মূলেই ফাঁক।" √কার্ (বিদারণে) হইতে ফাঁক অর্থে কার শব্দ। আ স্বার্থে প্রযুক্ত। ঐরূপে "আবাল" বালক অর্থে, "আবালী" বা "আবালি" বালিকা অর্থে কৃষ্ণকীর্তনের অনেক স্থলে প্রযুক্ত হইয়াছে। প্রাচীন বাঙ্গালায় বালিকা অর্থে "অকুমারী" শব্দের যথেষ্ট প্রয়োগ আছে। "অমন্দ" শব্দের মন্দার্থে প্রয়োগও এই প্রসঙ্গে তুলনীয়।

অ র্থ - সং কো চ ন

শব্দবিশেষের মূল অর্থের ব্যাপকতা কখনও কখনও কমিয়া যায়। ইহাকেই অর্থসংকোচন বলা হয়।

"অন্ন" শব্দের (অদ্ ধাতু হইতে উৎপন্ন) মূল অর্থ খাদ্য। বাঙ্গালীর প্রধান খাদ্য ভাত বলিয়া ক্রমশঃ অন্নের অর্থ সংকুচিত হইতে হইতে এখন কেবল ভাত অর্থাৎ সিদ্ধ চাউলে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

"মুনিষ" ও "মিন্সে" মনুষ্য শব্দের অপভ্রংশ হইলেও মানব সাধারণ অর্থে উহাদের ব্যবহার হইবে না।

বাঙ্গালায় চলিত বহু বিদেশী শব্দে অর্থসংকোচ ঘটিয়াছে। ইস্টিশেন, পিওন, টিকিট, ডাক্তার প্রভৃতি শব্দ তাহার নিদর্শন। ইস্টিশেন বলিলে

সাধারণতঃ railway station, পিওন বলিলে ডাকহরকরা এবং টিকিট বলিলে রেলের টিকিট বুঝায়। doctor শব্দের মূল অর্থ পণ্ডিত। এখন ডাক্তার বলিলে সাধারণতঃ চিকিৎসক বুঝায়। পইতা পবিত্র শব্দের অপভ্রংশ, কিন্তু বহুবিধ পবিত্র দ্রব্যের মধ্যে কেবল উপবীতকেই বুঝায়। "মৃগ" শব্দ প্রাচীন সংস্কৃতে পশুকে বুঝাইত। মৃগেন্দ্র শব্দে সেই অর্থ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু পরবর্তী কালে মৃগ বলিতে পশুজাতিকে না বুঝাইয়া বিশেষ এক জাতীয় পশুকে বুঝাইল। বাঙ্গালাতেও সেই অর্থই প্রচলিত। অবেস্তা ভাষায় "মরেঘ" শব্দের অর্থ পক্ষিজাতি। এই মরেঘ শব্দ হইতে ফারসী "মুর্গ" শব্দ আসিয়াছে, তাহা হইতেই বাঙ্গালা "মোরগ" এবং "মুরগী" শব্দের উৎপত্তি। এই "মোরগ" এবং "মুরগী" শব্দে অর্থসংকোচ দেখিতে পাই। আজিকার "কাগজ" বলিলে কেবল খবর কাগজকেই বুঝায়। পূর্ববঙ্গীয় ছাত্ররা খবর কাগজ অর্থে অনেক সময় "পেপার" বলিয়া থাকেন।

"পাউডার" বলিলে মুখে মাখিবার প্রসাধনচূর্ণ বুঝায়। "এসেন্স" শব্দের অর্থ সার, কিন্তু বাঙ্গালাদেশে "এসেন্স" বলিলেই পুষ্পসার অথবা একপ্রকার গন্ধদ্রব্যকে বুঝায়। এসব স্থলেও অর্থ সংকুচিত হইয়াছে। ফারসী চাকর শব্দের অর্থ বেতনভুক কর্মচারী। কিন্তু চাকর শব্দ কেবল গৃহভৃত্য অর্থে ব্যবহৃত হয়। আবার চাকরি বলিলে শুধু চাকরের কাজ বুঝায় না। "চাকরে" স্বামী বলিলে কি বুঝায়?

অ র্থ - আ রো প ণ

কখনও কখনও শব্দের মূল অর্থ সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়া নূতন অর্থ দেখা দেয়। ইহাকেই অর্থ-আরোপণ বলে। এক অর্থের স্থানে অন্য অর্থ আরোপিত হয় বলিয়াই এইরূপ নামকরণ। "বুজরুকি" শব্দের অর্থ আমরা জানি ভণ্ডামি এবং "বুজরুক্" এর অর্থ ভণ্ড, কুটিল বা ছলনাকারী। কিন্তু ফারসী "বুজুর্গ" শব্দ ("বুজরুক্" শব্দ যাহার রূপান্তর) ভাল অর্থেই ব্যবহৃত হয়। উহার অর্থ সম্মানিত ব্যক্তি, বয়োবৃদ্ধ, জ্ঞানী। "জ্যেঠামি" শব্দটিও অর্থারোপের দৃষ্টান্তস্থল। সংস্কৃতে "কৃপণ" শব্দের অর্থ "কৃপার পাত্র" বাঙ্গালায় হইয়াছে ব্যয়কুণ্ঠ। "ওঝা" (উপাধ্যায়) শব্দের মূল অর্থ পণ্ডিত বা জ্ঞানী, বর্তমান

অর্থ রোগ-চিকিৎসক। "হঠাৎ" সংস্কৃতে বুঝায় অবিমৃষ্যকারিতাবশতঃ; বাঙ্গালায় ইহার অর্থ অকস্মাৎ।

অর্থপরিবর্তনের কারণ

শব্দের অর্থ যে ভিন্ন ভিন্ন পরিবর্তন লাভ করে, তাহার কারণ কি? কারণ আছে, কিন্তু সেগুলি মানুষের মনে। মানবমনের চিন্তারাশির সংজ্ঞা এবং সংখ্যা দেওয়া যেমন অসম্ভব, অর্থপরিবর্তনের কারণসমূহেরও ঠিক তাহাই। তবে এই পর্যন্ত বলা যায় যে ভাবসংসর্গই (association of ideas) সকল কারণের মূলে ক্রিয়া করে। প্রত্যেক শব্দের মধ্যে পরস্পর-সংশ্লিষ্ট কতকগুলি ভাবের আভাস থাকে। কিন্তু শব্দটি শুনিলে প্রত্যেক ব্যক্তির মনেই যে একরূপ ভাবের উদয় হইবে, এমন নয়। কেহ শব্দটি শুনিবার সঙ্গে সঙ্গে সব কয়টি ভাবই গ্রহণ করিল, কেহ বা কতকগুলি মাত্র বুঝিতে পারিল, কাহারও মনে আবার অনুরূপ অন্য ভাবের উদয় হইল। এইগুলি চিন্তা করিয়া দেখিলে অর্থপরিবর্তনের মূলসূত্র কি, তাহা নির্ণয় করা সহজ হইবে।

অনেকগুলি শব্দ আলোচনা করিয়া দেখিলে অর্থপরিবর্তনের কয়েকটি মোটামুটি কারণ নির্ণয় করা চলে, কিন্তু নিঃশেষে সকল কারণ আবিষ্কার করা কখনও সম্ভব হইবে কিনা বলা যায় না। নিম্নলিখিতরূপে কারণগুলির মোটামুটি শ্রেণীবিভাগ করা যায়:

১. আলংকারিক প্রয়োগ: (ক) উপমান, ও উপমেয়, (খ) লক্ষ্যার্থ ও ব্যঙ্গ্যার্থ। ২. সৌজন্য ও শিষ্টাচার: (ক) মুসলমানী আদবকায়দা, (খ) বৈষ্ণবীয় বিনয়। ৩. বক্রোক্তি: (ক) অপ্রিয়তা নিবারণ, (খ) অন্ধ সংস্কার। ৪. ব্যাজোক্তি। ৫. পরিবেশের অনৈক্য (অবস্থাভেদ): (ক) স্থানগত, (খ) কালগত, (গ) পাত্রগত, (ঘ) সমাজগত, (ঙ) বস্তুগত। ৬. ভাবাবেগ। ৭. ব্যষ্টি স্থলে সমষ্টি। ৮. সমষ্টি স্থলে ব্যষ্টি: (ক) দেহের পরিবর্তে অঙ্গের নাম, (খ) এক ঘটনার দ্বারা আনুষঙ্গিক ঘটনার সম্বন্ধে ইঙ্গিত। ৯. অনবধানতা। ১০. অর্থদুষ্টি। ১১. অর্থের অনির্দিষ্টতা। ১২. গৌণার্থপ্রাধান্য।

১. আলংকারিক প্রয়োগ

আমরা ভাব পরিস্ফুটরূপে প্রকাশ করিবার জন্য অনেক সময় বিশেষণ, উপমা প্রভৃতি প্রয়োগ করিয়া থাকি। ইহার কারণ সুস্পষ্ট। একই শব্দের মধ্যে একাধিক ভাবের অস্তিত্ব থাকে। বক্তা যখন ভাববিশেষের প্রতি শ্রোতার মন আকর্ষণ করেন তখন এইরূপ বিশেষণ বা উপমার প্রয়োজন হয়। সুশ্রাব্য এবং মনোহারী করিবার জন্যও অলংকার প্রয়োজন। এইরূপ প্রয়োগে অর্থের পরিবর্তন ঘটে।

ভাট মুখে শুনিয়া বিদ্যার সমাচার।
উথলিল সুন্দরের সুখপারাবার॥—ভারতচন্দ্র
যাঁর নামে পার করে ভবপারাবার।
ভাল ভাগ্য পাটনী তাঁহারে করে পার॥—ভারতচন্দ্র
হৃদয় ডুবে যায় হরষ-পারাবারে।—ব্রহ্মসংগীত
অতল অপার মাতৃস্নেহ-পারাবার।—ধাত্রীপান্না

উপরিউক্ত চারিটি স্থলেই "পারাবার" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। পারাবার শব্দের মূল অর্থ সমুদ্র। সমুদ্রের নাম করিলেই মানুষের মনে নানা ভাবের উদয় হয়। সমুদ্রে জল আছে, তরঙ্গ আছে, মকর কুম্ভীর আছে। সমুদ্র কখনও প্রশান্ত, কখনও বিক্ষুব্ধ। কাহারও নিকটে সমুদ্র মনোহর, কাহারও নিকটে ভয়ংকর। উহা গম্ভীর, গভীর, মহান্‌ এবং উদার। সমুদ্র নামের সহিত এই সকল এবং আরও নানাবিধ ভাব জড়িত। তাই শুধু পারাবার শব্দে বিশাল জলরাশি বুঝাইলেও উপরিউক্ত ভিন্ন স্থলে পারাবারের তিনটি বিশেষ গুণ প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। প্রথমে পারাবার শব্দে আধিক্য বুঝাইতেছে। সমুদ্রে জল অধিক। সেই আধিক্য গুণটার প্রতিই কবির লক্ষ্য। এই কারণে সুখ-পারাবার বলিলে সমুদ্রকে না বুঝাইয়া তাহার একটা বিশেষ গুণকেই বুঝায়। আবার দ্বিতীয় ও চতুর্থ উদাহরণে পারাবার শব্দ দুস্তর অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। সমুদ্রের প্রশান্ত মহিমা, গম্ভীর সৌন্দর্য এখানে কবির মনকে আকর্ষণ করে নাই। কেবল উহার সীমাহীন বিস্তারের প্রতিই তাঁহার লক্ষ্য আবদ্ধ। তৃতীয় দৃষ্টান্তে পারাবারের গভীরতা এবং গৌণতঃ উহার তারল্য কবির লক্ষ্য। উপমার দ্বারা একই পারাবার শব্দ তিনটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

হৃদে বিষ মুখে মধু জিজ্ঞাসে ফুল্লরা।—কবিকঙ্কণ

এখানেও 'বিষ' বাচ্যার্থে ব্যবহৃত হইতেছে না। প্রাণের মত প্রিয় বস্তু মানুষের তো আর কিছুই নাই। বিষ সেই প্রাণ নাশ করে। সুতরাং মানুষ তাহাকে অনিষ্টকারী জানিয়া ঘৃণা করে, ভয় করে। আবার হিংসা, দ্বেষ, কুটিলতা প্রভৃতি যে সব প্রবৃত্তি মানবের মনকে নিয়ত পীড়িত করে এগুলিও অনিষ্টকারী। 'বিষ' এবং 'দ্বেষ', অনিষ্টকারিতা ইহাদের সামান্য গুণ। তাই ইহাদের একটা উক্ত হইলেও অন্যটা বুঝাইতেছে। 'মধু' সম্বন্ধেও ঐ কথাই বলা যায়। 'মধু' বলিতে উহার প্রধান গুণ মিষ্টতাই কবির লক্ষ্য। "মুখমিষ্টি" "ঠোঁট পাতলা" "হাড় কালি" [১৮] এই তিনটি কথা দেখুন। প্রথম দৃষ্টান্তে 'মিষ্টি' শব্দটি রসনেন্দ্রিয়গ্রাহ্য ষড়্ রসের অন্যতম যে মধুর রস, তাহাকে বুঝাইতেছে না। যে সুন্দর কথা কলে তাহার মুখকে মিষ্ট বলা হয়। 'ঠোঁটপাতলা' লোকের ঠোঁট পাতলা না-ও হইতে পারে। যে ব্যক্তি কথা চাপিয়া রাখিতে পারে না তাহাকে 'ঠোঁটপাতলা' বলা হয়। পাতলা শব্দের গুণই এই যে তাহা সহজেই ছিঁড়িয়া যায় অর্থাৎ তাহা সহজভেদ্য। তাহার দ্বারা কোনো জিনিস আবৃত রাখা নিরাপদ নয়। কারণ আবরণ ভেদ করিয়া তাহা অনায়াসেই বাহির হইয়া আসে। বিপরীত দিক দিয়া বিচার করিলে দেখা যায়, যাহার মধ্য দিয়া কোনো বস্তু সহজে নির্গত হইয়া আসে তাহা 'পাতলা'। সুতরাং যাহার ঠোঁটের মধ্য দিয়া সহজেই কথা বাহির হয় তাহার ঠোঁটকে 'পাতলা' আখ্যা দেওয়া হইল। আবার 'পাতলা' শব্দের মূল অর্থও এই ভাবেই পাওয়া যাইবে। যাহা পত্রের ন্যায় তাহাই 'পাতলা'। হাড় স্বভাবতই শ্বেতবর্ণ। তাহা কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছে এই কল্পনার মধ্যে অনেকখানি ব্যথার ইতিহাস প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। কাঠ আগুনে পুড়িলে কাল হয়। মনের দুঃখও আগুনের সমান। তাহার সংস্পর্শে দেহমধ্যস্থ অস্থি কাল হইয়াছে এই কল্পনাই 'কালি' শব্দের অর্থপরিবর্তনে সহায়তা করিতেছে। 'কালি' শব্দের মূল অর্থ কৃষ্ণবর্ণ কিন্তু এখানে যন্ত্রণাক্লিষ্ট। আবার লাল কালি শব্দে 'কালি'র অর্থ আর এক প্রকার। সে আলোচনা অন্যত্র করা হইয়াছে।

১৮. যেমন, মাস হয়েছে ভাজা ভাজা হাড় হয়েছে কালি। —ছেলেভুলানো ছড়া

(ক) উপমান এবং উপমেয়

উপমায় দ্বারা উপমেয় যেমন অর্থ পরিবর্তন করে উপমানের অর্থও তেমনি বদলাইয়া যায়।

আনন্দ অমৃতরূপে উদিবে হৃদয় আকাশে।—ব্রহ্মসংগীত

এখানে অমৃত শব্দে চন্দ্রকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। সুতরাং উপমান 'চন্দ্র' উহ্য থাকিলেও চন্দ্র যে অমৃতার্থক বা অমৃতময় তাহা পাঠকের বিলম্ব হয় না।[১৯]

'আকাশ' শব্দের উল্লেখ থাকাতে অমৃতকে একবার উপমেয় বলিয়া ধরিলাম। আবার 'আনন্দ' শব্দের সম্পর্কে ব্যাখ্যা করিতে হইলে অমৃত উপমেয় নয় উপমান।

'নুন খাই যার গুণ গাই তার' এই প্রবাদ বাক্যে 'নুন' উপমান; উপমেয় ক্ষুদ্র উপকার বা ঐরূপ অন্য কোনো শব্দ উহ্য। কিন্তু সেই উহ্য উপমেয়ের দ্বারাও 'নুনে'র বাচ্যার্থ বদলাইয়া গিয়াছে। এখানে 'নুন'-এর অর্থ 'অতিতুচ্ছ সাহায্য'।

আবার পরস্পরের সাহচর্যে উভয়েই অর্থ বদলায়। তবলার বাদ্য শুনিতে শুনিতে যখন বলি—তবলচির হাতখানি মিঠে, তখন 'হাত'-এর অর্থ বাদ্যধ্বনি এবং 'মিঠে'র অর্থ সুশ্রাব্য।

(খ) লক্ষ্যার্থ এবং ব্যঙ্গ্যার্থ

মূলকথা শব্দের শক্তি অসীম। একই কথার মধ্যে অসংখ্য ভাবের ব্যঞ্জনা থাকে। বাচ্যার্থ ব্যতীতও অন্যান্য যে সব অর্থ প্রভৃতি শব্দের মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকে আলংকারিক প্রয়োগের দ্বারা সেগুলি প্রকাশিত হয়। তখনই শব্দের নূতন অর্থ জন্মলাভ করিল বলা যায়। সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রে অর্থ ত্রিধা বিভক্ত; বাচ্যার্থ, লক্ষ্যার্থ এবং ব্যঙ্গ্যার্থ।

আম্বু জাম্বু মুকুলিল ভরে নোআঁইল ডাল।—কৃষ্ণকীর্তন

এই ছত্রে 'ডাল' বাচ্যার্থে বৃক্ষশাখা অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে। আবার

যে ডালে করোঁ মো ভরে সে ডাল ভাঙ্গিঞা পড়ে।—কৃষ্ণকীর্তন

১৯. 'সুধাকর' প্রভৃতি চন্দ্রার্থক শব্দও এই প্রসঙ্গে তুলনীয়।

এখানে 'ডাল' শব্দ বৃক্ষশাখা না বুঝাইয়া ব্যঞ্জনায় দ্বারা 'আশ্রয়' এই অর্থ বুঝাইতেছে।

পাখীর পক্ষে ডাল আশ্রয়। এস্থলে পাখীর নাম না থাকিলেও 'ডাল' শব্দের দ্বারা আশ্রয় এই ভাবটি বুঝিবার পক্ষে কোনো বাধা হয় না। এখানে ডালের যে অর্থ তাহাকে ব্যঙ্গ্যার্থ বলা হয়।

'বৈকুণ্ঠ' শব্দে বিষ্ণুলোক বুঝি। কিন্তু

'শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান।'

রবীন্দ্রনাথের এই ছত্রে বৈকুণ্ঠ শব্দে বৈকুণ্ঠবাসী দেবগণকে বুঝাইতেছে।

বাচ্যার্থ ব্যতীতও শব্দের লক্ষ্যার্থ এবং ব্যঙ্গ্যার্থ প্রকাশের শক্তি আছে বলিয়াই উপমার দ্বারা শব্দের অর্থ পরিবর্তিত হয়।

২. সৌ জ ন্য ও শি ষ্টা চা র

বয়স্ক এবং মান্য ব্যক্তির সহিত বাক্যালাপে অনেক সময় শব্দের মূল অর্থ বদলাইয়া যায়। উত্তম পুরুষে গৌরবার্থক যে সর্বনাম পদটি আমরা ব্যবহার করি তাহার মূল অর্থ অন্য রকম ছিল। "আপনি" শব্দের উৎপত্তির ইতিহাস অত্যন্ত কৌতূহলজনক। সংস্কৃত আত্মন্ শব্দ হইতে ইহা উৎপন্ন হইয়াছে, আত্মন্ শব্দের অর্থ নিজ।[২০] আপন-পর, আপন-খাওয়া, আপনা-আপনি প্রভৃতি কথায় 'আপন' বা 'আপনি' শব্দের মূল অর্থ এখনও বর্তমান। প্রাচীন বাঙ্গালায় নিজ অর্থেই বরাবর 'আপন' শব্দের ব্যবহার হইয়া অসিয়াছে। আধুনিক অর্থে ঐ শব্দের ব্যবহার অধিক দিন আরম্ভ হয় নাই[২১]।

(ক) অপণে অপা বুঝ তু নিঅ মণ।—চর্যাপদ

(খ) অপণা মাংসেঁ হরিণা বৈরী।— „

(গ) আপণে মেলিব আসি নাগর কাহ্নে।—কৃষ্ণকীর্তন

(ঘ) আপণা চিহ্নিআঁ বাঁশী দেহ মোরে আণী।— „

২০. অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত The Origin and Development of the Bengali Language গ্রন্থের ৮৪০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

২১. হিন্দী 'আপ্' শব্দ প্রথম পুরুষেও ব্যবহৃত হয়। "আপ্ কৌন্ হৈ" বলিলে 'আপনি কে' এবং 'ইনি কে' দুই-ই বুঝাইতে পারে।

চর্যাপদ এবং কৃষ্ণকীর্তন হইতে 'আপণ' শব্দের কয়েকটি প্রয়োগ উদ্ধৃত করা হইল। (ক) চিহ্নিত উদাহরণে মধ্যম পুরুষ সর্বনাম 'তু'-এর সহিত আপন শব্দের ব্যবহার হইয়াছে। আপন শব্দের অর্থ নিজ বা নিজে। সুতরাং তিনি নিজে, আমি নিজে, প্রভৃতি অর্থে সকল পুরুষের সর্বনামের সহিতই ইহা ব্যবহৃত হইতে থাকে। কিন্তু মধ্যমপুরুষের সর্বনামের একটা বিশেষ গুণ এই যে, কথোপকথনের কালে উহা উহ্য থাকিলেও অর্থপ্রকাশের পক্ষে কোনো বাঁধা জন্মে না। কখন আসিয়াছ?—বলিলে তুমি কথাটির উচ্চারণ করা অনাবশ্যক। কিন্তু কখন আসিয়াছে?—বলিতে হইলে কর্তার উল্লেখ করা প্রয়োজন। কথাবার্তার সময় মধ্যম পুরুষের কর্তা সাধারণত একজনই হইয়া থাকে। প্রথম পুরুষের কর্তা অনেকে হইতে পারে। এই কারণেই মধ্যম পুরুষের কর্তার সহিত 'আপনি' শব্দ প্রযুক্ত হইতে হইতে কর্তা স্বয়ং উহ্য হইয়া গেল এবং 'আপনি' একাই তাহার অর্থ প্রকাশ করিতে লাগিল। অবশেষে 'আপনি' নিজেই মধ্যম পুরুষের সর্বনামরূপে নূতন অধিকার গ্রহণ করিয়া বসিল। কিন্তু 'নিজ' অর্থও ত্যাগ করিল না।

'আপনি' করিলে দূর আপন মহত্ত্ব।—চণ্ডীমঙ্গল
আপন সাক্ষীতে সাধু হারিল 'আপনি'।— „

উপরিউক্ত উদাহরণ দুইটিতে নিজ এই অর্থেই 'আপনি' শব্দের ব্যবহার হইয়াছে। তবে ক্রিয়াপদের ব্যবহার এবং অন্বয় দেখিয়া গৌণ অর্থটি 'তুমি' অথবা 'সে' তাহা নির্ণয় করা যায়। এখানেও দেখি একলা 'আপনি' তুমি অর্থে বসে নাই।

পরিচয় দেহ আগে কে বট 'আপনি'।—অন্নদামঙ্গল
শিব যদি যান কভু কুচুনির বাড়ী।
ভাবহ 'আপনি' কত কর তাড়াতাড়ি॥— „

উল্লিখিত দুইটি উদাহরণে 'আপনি' আর একটি আপন শব্দের সাহায্য ব্যতিরেকেও বসিয়াছে এবং একাকীই তুমি অর্থ প্রকাশ করিতেছে। অবশ্য অন্বয় এবং ক্রিয়াপদের দ্বারাই তাহা বুঝা যাইতেছে। প্রথম উদাহরণের 'বট' এবং দ্বিতীয় উদাহরণের 'কর' এই দুই ক্রিয়া মধ্যম পুরুষের পদ।

তুমি অর্থ কোনো রকমে প্রকাশ করিলেও গৌরবসূচক অর্থ এখনও

পাওয়া যাইতেছে না। কিন্তু সাহিত্যে না প্রবেশ করিলেও ভাষায় ইহার নূতন অর্থ সম্ভবতঃ ধীরে ধীরে প্রচলিত হইতেছিল।

গুরুজনকে কিম্বা মান্যব্যক্তিকে প্রথম পুরুষে মহাশয় বা ঐরূপ কোনো শব্দের দ্বারা সম্বোধন করার রীতি সংস্কৃতে আছে। 'ভবৎ' শব্দের ব্যবহারই তাহার প্রমাণ। ইংরাজী your hononr-ও ঐ ধরণেরই প্রয়োগ। পল্লীগ্রামে এখনও শুনি;—'মশায়ের নিবাস?'—অর্থাৎ আপনার বাড়ী কোথায়? 'কবে আসা হল?' 'এখন কি করা হচ্ছে?' প্রভৃতি প্রয়োগে 'তুমি' কথাটি উচ্চারণ না করিয়া কাজ চালাইয়া লইবার প্রচ্ছন্ন প্রয়াস অনেক সময় প্রকট হইয়া পড়ে। যখন শ্রোতাকে তুমি' বলিলে শ্রোতা ক্ষুণ্ণ হইতে পারেন, আবার আপনি বলিয়া তাঁহাকে গৌরবান্বিত করিবার মত উদারতাও যখন বক্তার থাকে না, তখনই ভাববাচ্যে বাক্যের প্রয়োগ হইয়া থাকে। ভাববাচ্যে ক্রিয়ার রূপ প্রথম এবং মধ্যম পুরুষে সমান থাকে বলিয়াই এইরূপ প্রয়োগের প্রচলন।

গৌরবে মধ্যম পুরুষকে প্রথম পুরুষের শব্দের দ্বারা সূচিত করার পদ্ধতি উর্দু ভাষাতেও দেখিতে পাওয়া যায়। 'হুজুর' শব্দের প্রয়োগ তাহার দৃষ্টান্ত[২২]।

বাঙ্গালায় 'তুমি'র পরিবর্তে 'আপনি' ব্যবহারের মূলে এইরূপ একটা সম্ভ্রম এবং শিষ্টাচারের ভাবই ক্রিয়া করিয়াছে। আর 'আপনি' শব্দটা তৎপূর্বে ভাষায় 'তুমি আপনি' রূপে 'তুমি'র সহিত ব্যবহৃত হইতে থাকায় মধ্যম পুরুষের ভাবও প্রকাশ করিতেছিল। সুতরাং ঐ অর্থে সহজেই প্রচলিত হইয়া গেল। কিন্তু মূলে যে আপনি প্রথম পুরুষের শব্দ তাহা উহার ক্রিয়া পদ হইতেই বুঝা যায়। 'তিনি' শব্দ যে ক্রিয়া পদ গ্রহণ করে, 'আপনি' শব্দের পাশেও ঠিক সেই পদ বসে। যেমন, 'তুমি কর' কিন্তু 'তিনি করেন' এবং

২২. রবীন্দ্রনাথের 'শাজাহান' কবিতায় এই ধরণের একটি প্রয়োগ দ্রষ্টব্য।

এ কথা জানিতে তুমি ভারতঈশ্বর শা-জাহান,
কালস্রোতে ভেসে যায় জীবন যৌবন ধনমান।
শুধু তব অন্তর বেদনা
চিরন্তন হয়ে থাক্, 'সম্রাটে'র ছিল এ সাধনা।

'তুমি' দিয়া কবিতা আরম্ভ করিয়াও কবি তোমার অর্থে 'সম্রাটের'—এই রূপ প্রয়োগ করিয়াছেন।

'আপনি করেন'। 'তুমি যাবে' কিন্তু 'তিনি যাবেন' এবং 'আপনি যাবেন'। 'তুমি দেখছ' কিন্তু 'তিনি দেখছেন' এবং 'আপনি দেখছেন'।

পত্রের পাঠে যে সকল শব্দ ব্যবহৃত হয়, তাহা অধিকাংশস্থলেই কেবল রীতিরক্ষার জন্য। মুখোমুখি দেখা হইলে যাঁহাকে একটি মাত্র প্রণাম করি, চিঠিতে তাঁহাকে 'শতকোটী ভূমিষ্ঠ প্রণাম' জানাই। যাঁহাকে 'মান্যবর' বা 'মাননীয়' বলিয়া সম্বোধন করি তিনি যে প্রকৃতই সম্মানের অধিকারী একথা আমরা ভাবি না। এই সকল শব্দ সম্ভ্রম, সৌজন্য, বিনয় এবং শিষ্টাচারবশতঃ অর্থ পরিবর্তন করিয়াছে। ক্রিয়া-কর্ম উপলক্ষে আমরা যখন কাহাকেও আহারের নিমন্ত্রণ জানাই তখন 'শাকান্নে'র আয়োজন হইয়াছে এই কথাই বলি। কিন্তু মুখ ফুটিয়া যাহাই বলা হউক না কেন শ্রোতার কাছে তাহার অর্থ সুস্পষ্ট। তাহা না হইলে আহ্বানকারীর গৃহে অতিথি সমাগম হইত না, ইহা নিঃসন্দেহ। আজকাল আমরা যখন 'চা'-এর নিমন্ত্রণ করি তখন শুধু চায়ের ব্যবস্থা করিয়াই নিরস্ত হই না।

(ক) মুসলমানী আদব-কায়দা

মুসলমান জাতি শিষ্টাচারের জন্য বিখ্যাত। বক্তা যখন শ্রোতাকে নিজের বাড়ীর কথা বলেন তখন তাহা হয় 'গরীবখানা', কিন্তু শ্রোতার বাটী 'দৌলতখানা' বলিয়া বর্ণিত হয়। কার্যতঃ 'গরীবখান'ও প্রাসাদ হইতে পারে এবং মৃৎকুটিরের পক্ষেও 'দৌলতখানা' আখ্যা লাভ বিচিত্র নয়। বক্তা 'আর্জি' করেন এবং শ্রোতা 'ফরমাস' করেন। আইন-সংক্রান্ত শব্দগুলি মুসলমানী রীতির প্রভাবে অনেকস্থলে অর্থ পরিবর্তন করিয়াছে। তাই আমরা আবেদনপত্র 'অধীনে'র নিবেদন জানাই।

(খ) বৈষ্ণবীয় বিনয়

বৈষ্ণবগণের বিনয় অনেক সময় মাত্রা ছাড়াইয়া যায়, তাই কেহ কেহ বৈষ্ণবীয় বিনয়কে 'বিনয়ন্তা' বলিয়া পরিহাস করেন। আধিক্যতা (< আদিখ্যেতা)র সাদৃশ্যেই এই পদের উৎপত্তি হইয়াছে কি না জানি না। মহাপ্রভুর 'দাসানুদাস'গণ যখন শিষ্যের বাড়ীতে 'পায়ের ধুলো দেন' তখন অন্ততঃ পাঁচ সাত 'মূর্তি'র দর্শন পাওয়া যায়। 'ভোগ' প্রস্তুত হইলে

রাধাশ্যামকে 'ভোগ দেখাইয়া' তাঁহারা 'সেবা করেন'। পাতে কিছু থাকিলে গৃহস্থ 'প্রসাদ পায়।' পাপী তাপীর\উদ্ধারের জন্য তাঁহাদের 'আবির্ভাব' হয়। 'লীলাবসানে' তাঁহারা 'দেহরক্ষা করেন' বা 'তিরোহিত হন'। আমরা সাধারণ জীব—'জন্ম' 'মৃত্যু'র হাত হইতে কখনও নিষ্কৃতি পাই না।

'বৈষ্ণবীয় বাঙ্গালায়' বিনয় এবং গৌরব দুইই আছে। অপরের সম্বন্ধে গৌরব এবং নিজের প্রসঙ্গে বিনয় রক্ষা করিতে হইবে—কথাবার্তার কালে বক্তার এই সচেতন ভাব ভাষার মধ্যে কতকগুলি শব্দের অর্থ পরিবর্তনে সাহায্য করিয়াছে। কিন্তু এ ধরণের প্রয়োগ সাধারণতঃ সম্প্রদায়ের মধ্যে নিবদ্ধ থাকে। তবে কোনো বিশেষ সম্প্রদায় যখন সমগ্র জাতির উপর প্রভাব বিস্তার করে তখন সেই জাতির ভাষাও সমগ্রভাবেই সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্যগুলি আপনার অন্তর্ভুক্ত করিয়া লয়।

৩. ব ক্রো ক্তি

সাদাসিধা ভাবে না বলিয়া প্রকারান্তরে যে কথা বলা হয় তাহাকেই বক্রোক্তি বলা হইতেছে। পশ্চিমবঙ্গে দীক্ষাদানকারী বৈষ্ণব সন্ন্যাসীকে পরিহাসচ্ছলে 'কানফুঁকা বাবাজী' বলিয়া থাকে। 'কানফুঁকা' শব্দের অর্থ—কানে যে ফুঁ দেয় অর্থাৎ নিঃশব্দে মন্ত্রোচ্চারণ করে। ইহা একটি বক্রোক্তির উদাহরণ। মুরগীর স্থলে রামপাখী', শুয়ারের স্থলে 'শুঁড়কাটা হাতী' প্রভৃতি শব্দের মধ্যেও বক্রোক্তি আছে।

(ক) অ প্রি য় তা - নি বা র ণ

পরিহাসের উদ্দেশ্যে অনেক সময়ে ঘুরাইয়া কথা বলা হয় বটে, কিন্তু বাক্যের রূঢ়তা এবং অপ্রিয়তা-নিবারণই অধিকাংশ ক্ষেত্রে বক্রোক্তির মুখ্য কারণ। সত্য হইলেও অপ্রিয় কথা বলিতে নাই—এই উপদেশটি বুদ্ধিমান্ লোকমাত্রেই পালন করেন। তাহার ফলে অনেক শব্দ আক্ষরিক অর্থ পরিত্যাগ করিয়াছে। প্রিয়জনের বিদায়কালে 'এস' শব্দ যাও অর্থ সূচনা করে। প্রাচীন বাঙ্গালায় মিলনার্থক 'মেলানি' শব্দ বিদায় অর্থে ব্যবহৃত হয়। 'হরিজন', 'দরিদ্রনারায়ণ',

'নমোশূদ্র'[২৩] প্রভৃতি শব্দের মধ্যে একটি সহৃদয়তার ভাব লক্ষ্য করা যায়। যে মনোবৃত্তির প্রভাবে অন্ধকে অন্ধ এবং খঞ্জকে খঞ্জ বলিতে দ্বিধা বোধ করি, এই শব্দগুলির মূলেও সেই মনোভাব বর্তমান। কলিকাতায় ঝাড়ুদারকে 'জমাদার' বলিয়া সম্বোধন করি। সমগ্র বাঙ্গালা দেশে পাচককে 'ঠাকুর' বলিয়া ডাকা হয়। উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে পাচক ব্রাহ্মণ 'মহারাজ' সম্বোধনে আপ্যায়িত হন। পশ্চিমবঙ্গের অঞ্চলবিশেষে এবং উড়িষ্যায় পাচক ব্রাহ্মণকে 'পূজারী বামুন' বা শুধু 'পূজারী' বলিয়া ডাকা হয়।

ঘুষ অনেকে দিয়া থাকেন, সুবিধা পাইলে লইতেও আপত্তি করেন না। কিন্তু ভদ্র সমাজে সে কথা উচ্চারণ করিলেই যত গণ্ডগোল। তাই বড়বাবুকে 'ভেট' দিই এবং কর্মচারীদিগকে 'পান' খাইবার জন্য কিছু দিয়া থাকি। 'ঘুষ' শব্দের রূঢ় নগ্নতা নিবারণের জন্য অন্যান্য ভাষাতেও এইরূপ নানা ধরণের উক্তি প্রচলিত আছে।

দারিদ্র্যের মত কলঙ্ক মানুষের আর কিছুই নাই। তাই ভদ্রসমাজস্থ দরিদ্র ব্যক্তিকে দরিদ্র না বলিয়া 'তাঁহার অবস্থা ভাল নয়' বলি। আবার কন্যার পিতা কৃষ্ণবর্ণ কন্যাকে 'উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ' বলিয়া ঘোষণা করেন; ইহা হইতে সেই 'আসমান গোলা'র গল্প মনে পড়ে। বনিয়াদী বংশের দুই বন্ধু—তাঁহাদের পূর্বপুরুষ নবাব বাদশাহ ছিলেন। বন্ধুদ্বয়ের কিন্তু বংশগৌরব ব্যতীত আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। একদিন এক বন্ধু দ্বিতীয় বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলেন;—কি দিয়া ভাত খাওয়া হইল? দ্বিতীয় উত্তর করিলেন;—বিশেষ কিছুই হয় নাই. শুধু 'আসমানগুল্লা কী চটনী' আর 'ভূঁইঅণ্ডে কা কাবাব' হইয়াছিল। এই দুইটিমাত্র ব্যঞ্জন দিয়াই আহার সমাপ্ত হইয়াছে। বংশ-মর্যাদা সম্বন্ধে সচেতন বাদশাহবংশধর কচু অর্থে 'ভূঁই অণ্ডা' এবং আমড়া অর্থে 'আসমান গুল্লা' শব্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন।

স্বামী স্ত্রী এদেশে পরস্পরকে নাম ধরিয়া আহ্বান করেন না। তাই

২৩. এখানে 'নমো' 'শূদ্র'-এর গৌরব বাড়ায় নাই। 'নমে'শূদ্র' 'নমো' নামেই অধিকতর প্রচলিত। সংস্কৃত 'নমস্‌' শব্দের সহিত ইহার কোনো যোগ সম্ভবতঃ নাই। 'শূদ্র' অপেক্ষাকৃত উচ্চতর জাতি। সেইজন্য 'নমো'-এর সহিত 'শূদ্র' যোগ করিয়া উহাদিগকে 'শূদ্র'-এর পর্যায়ভুক্ত করিয়া লইবার চেষ্টা হইয়াছে।

একজন যখন অপরের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চান তখন 'ওগো' বলিয়া সম্বোধন করেন। বাঙ্গালী পাঠককে সত্যেন্দ্রনাথের 'ওগো' কবিতাটির কথা স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে না। একজন অপরের উদ্দেশ্যে কথা বলিলে 'উনি' 'তিনি' প্রভৃতি সর্বনাম শব্দের প্রয়োগ করিয়া থাকেন। আবার পুত্র কন্যার নাম করিয়া 'অমুকের বাবা' 'অমুকের মা' বলিয়াও স্ত্রী স্বামীর এবং স্বামী স্ত্রীর উল্লেখ করেন।

পল্লীগ্রামের স্ত্রীলোকগণ পরস্পরের মধ্যে বাক্যালাপের কালেও 'অমুকের মা' বলিয়া চালান। অনেক সময় 'অমুকের পো' বলিয়া পুরুষকে এবং 'অমুকের ঝি' বলিয়া স্ত্রীলোককে সম্বোধন করা হয় কিন্তু সে সে ক্ষেত্রে পিতার নাম না করিয়া পদবীর উল্লেখ করা হয়। যেমন;—'দাসের পো' 'ঘোষের ঝি' ইত্যাদি। পিতার পদবীর স্থলে বৃত্তির উল্লেখও করা হয়। যেমন; 'ডাক্তারের পো', 'মাস্টারের পো'। এইরূপ প্রয়োগ কখনও কখনও স্বার্থেও হয় অর্থাৎ যে নিজে ডাক্তার এবং যাহার পিতা ডাক্তারি করেন নাই— এইরূপ ব্যক্তিকেও পল্লীগ্রামে বয়োজ্যেষ্ঠ লোকেরা 'ডাক্তারের পো' বলিয়া থাকেন।

(খ) অ ন্ধ সং স্কা র

অন্ধসংস্কার এবং ভয়বশতঃ অনেক সময় প্রকৃত শব্দের উচ্চারণ না করিয়া অন্য শব্দের দ্বারা উদ্দিষ্ট বস্তুকে বুঝানো হয়। শিশুরা রাত্রিকালে সাপ বলে না, 'লতা' বলে। ঐ কারণেই ব্যাঘ্রের নাম হইল 'দক্ষিণ রায়', গাছে 'ভূত' আছে না বলিয়া 'দেবতা' আছেন বলা হয়। আমরা বসন্ত রোগকে 'মায়ের অনুগ্রহ' বলিয়া সসম্ভ্রমে নমস্কার করি। ওলাওঠার 'ওলাদেবী'ত্বের মূলেও ভয় এবং অন্ধবিশ্বাস পুঞ্জীভূত রহিয়াছে। ভাঁড়ারে চাল না থাকিলেও 'নাই' বলিতে নাই। নাই বলিলে যদি চিরকালই না থাকে—এই আশঙ্কা। তাই চাল 'বাড়ন্ত' বলিয়া শব্দের প্রকৃত অর্থের বিরপীত অর্থ বুঝাই। সধবা স্ত্রীলোক শাঁখা খুলিয়া রাখেন না, 'ঠাণ্ডা করিয়া' বা 'শীতলিয়া' রাখেন। যেমন,

কঙ্কণাদি আভরণ 'শীতলিয়া' রাখে।—শিবায়ন

'খুলা' শব্দ উচ্চারণ করিলে যদি সত্যই চিরদিনের জন্যই খুলিয়া ফেলিতে

হয়, এই ভয়ে শাঁখা বা লোহা সম্বন্ধে এই শব্দ ব্যবহার করা তাঁহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ[২৪]।

'আন্নাকালী', 'ফেলারাম' প্রভৃতি নামের মধ্যেও অন্ধসংস্কারজাত বক্রোক্তির নিদর্শন পাওয়া যায়। এ সম্বন্ধে অন্যত্র আলোচনা করিয়াছি। সন্তানের প্রতি কুদৃষ্টিপাতকারী বা তাহার অমঙ্গলকামীর মৃত্যু কামনা করিয়া অথবা দেবতার আশীর্বাদ প্রার্থনা করিয়া সন্তানের স্বাস্থ্যাদির উল্লেখ করার মেয়েলী প্রথা এদেশে প্রচলিত। তাই আমরা বলি, 'শত্রুর মুখে ছাই দিয়া' অমুক ভাল আছে, 'ষেঠের কোলে' অমুকের বয়স এত বৎসর ইত্যাদি। গুজরাট প্রদেশেও এইরূপ একটি রীতি আছে, প্রাসঙ্গিকবোধে তাহা এখানে উল্লেখ করিতেছি। যে ব্যক্তির অসুখ হইয়াছে তাহার নাম না করিয়া অনেক সময় তাহার শত্রুর অসুখ হইয়াছে এইরূপ বলা হয়। রামের শত্রুর জ্বর হইয়াছে এই কথা বলিলে বুঝিতে হইবে রামের জ্বর হইয়াছে।

যাহা প্রার্থনীয়, নাম করিলে পাছে সে না আসে এইরূপ আশঙ্কায়, নাম ঘুরাইয়া বলা হয়। মেঘ করিলে ছেলেরা শিল পড়িবে না বলিয়া 'খই' পড়িবে বলে। এখানে 'খই'-এর অর্থই শিল।

কোনো কোনো জাতির ধর্মবিশ্বাস এমনই উৎকট যে অধর্ম আশঙ্কায় তাঁহারা অনেক কথা উচ্চারণ করেন না। বৈষ্ণবরা নাকি জবাফুলের নাম করেন না। অন্য নাম করিয়া ইঙ্গিতে তাহা বুঝাইয়া দেন। 'কাটা' শব্দ তাঁহাদের উচ্চারণ করিতে নাই। 'কাটা'র স্থলে তাঁহারা 'বানান' বলেন। এই সম্পর্কে একটি চমৎকার গল্প আছে। 'দুর্গানগরের মাঠে বেলগাছের তলায় একটি ছাগ শিশুকে দুই খণ্ড করিয়া কাটা হইয়াছে। রক্তে মাঠ ভাসিয়া যাইতেছে'—এই ঘটনাটি জনৈক বৈষ্ণব অপরের নিকট বিবৃত করিতেছেন: 'হাতীশুঁড়োর মা নগরের মাঠে তেপাতা-গাছের তলায়

২৪. অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে 'শিথিল' শব্দ হইতে উচ্চারণ সাদৃশ্যে 'শীতল' শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। খুলিয়া রাখার সহিত শীতল করার কোনো যো নাই। কিন্তু প্রাচীনদের মুখে 'ঠাণ্ডা করা' কথাটি সবিশেষ প্রচলিত। অবশ্য ঐ কথার উপর জোর দিয়া বিশেষ কিছু বলা চলে না। শিথিল হইতে উচ্চারণসাম্যবশতঃ শীতল এবং তাহার প্রতিশব্দ শীতল শব্দেরই প্রতিশব্দরূপে 'ঠাণ্ডা' চলিয়া যায়। এমন হওয়া অসম্ভব নয়। দেবতার 'সন্ধ্যারতি' অর্থেও 'শীতল দেওয়া' কথাটির ব্যবহার আছে।

াছাকে ছু-খানা করে বানিয়েছে। রসায় মাঠ ভেসে যাচ্ছে।' ইহার একটি পাস্তর আছে। 'ছাতীওঁড়োর মা নগরের মাঠের পূবে তেকড়ঙীর গাছের তলায় গোঁসাইকে এমন বানান বানিয়েছে যে গোঁসাই রসে ডগমগ।' অর্থাৎ দুর্গানগরের মাঠের পূর্বদিকে বেলগাছের তলায় গোঁসাইকে এমনভাবে কাটিয়াছে যে গোঁসাই রক্তে (যেন) ডুবিয়া গিয়াছেন।'

৪. ব্যাজোক্তি

কোনো ভাব শ্রোতার মনে ভালরূপে প্রবেশ করাইবার জন্য আমরা অনেক সময় এমন শব্দ ব্যবহার করি যাহার আক্ষরিক অর্থ লক্ষ্যার্থের ঠিক বিপরীত। যে বোকা তাহাকে 'অতিবুদ্ধি' বলা হয়। যেমন, 'অতিবুদ্ধি'র গলায় দড়ি। বাঙ্গালায় 'দেড়চালাকি' বলিয়া একটি শব্দ আছে। উহার অর্থ অতি চালাকি বা বোকামি। গুজরাটীতেও 'দোঢ়চতুর' শব্দ অনুরূপ অর্থে ব্যবহৃত হয়। তাহাও এই প্রসঙ্গে তুলনীয়। সংস্কৃতে 'মহাব্রাহ্মণ' 'মহাবৈদ্য' প্রভৃতি শব্দে যে অর্থপরিবর্তন ঘটিয়াছে তাহাও ব্যাজোক্তিসমুদ্ভূত বলিয়াই মনে হয়। 'বুদ্ধির ডিপো' বলিয়া যাহার সম্বন্ধে উল্লেখ করি সে ব্যক্তিকে নির্বোধ বলিয়াই মনে করি। মিথ্যাবাদী লোককে 'ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির' বলিয়া গালাগালি দেওয়া হয়। 'পরদ্রব্য লোষ্ট্রবৎ মনে করিবার' জন্য অনেক 'মহাত্মা'কে 'শ্রীঘরে' বাস করিতে হয়। 'মামাবাড়ী'র আদরও তাঁহাদের অদৃষ্টে দুর্লভ নয়। পুলিসের লোক 'পূর্ণচন্দ্র' গ্রহণ করিয়াও 'অর্ধচন্দ্র' দিয়া সম্মানিত করে।

৫. পরিবেশের অনৈক্য

পরিপার্শ্বিক অবস্থা-পরিবর্তনের সহিত শব্দার্থ-পরিবর্তনের সম্বন্ধ খুব নিকট। স্থান-কাল, রীতি-নীতি প্রভৃতি বদলাইলেই শব্দের অর্থও বদলাইয়া যায়।

(ক) স্থানগত

উত্তরপশ্চিম ভারতে 'বিচ্ছু' বলিলে 'কাঁকড়া বিছা' বুঝায় আর এ দেশে 'বিছা' শব্দ লম্বা তেঁতুলে-জাতীয় বিছাকেই বুঝাইয়া থাকে। আমাদের 'শাক' এবং হিন্দী 'শাক' (বা সাক) একই শব্দ, কিন্তু অর্থ পৃথক। আমরা 'শাক' বলিলে 'অপক্ক' পত্র বুঝি, হিন্দীতে উহার অর্থ 'পক্ক' ব্যঞ্জন। পূর্ববঙ্গে 'বালাম' শব্দে এক ধরণের নৌকা বুঝায়। 'বালামে' করিয়া যে চাল আসে তাহাকে

পশ্চিমবঙ্গের লোক 'বালাম' চাল নাম দিল। এইরূপে চালবিশেষের নাম রূপেই 'বালাম' শব্দ প্রচলিত হইতে লাগিল, মূল অর্থ অন্তর্হিত হইল। ফারসী 'দরিয়া' শব্দের অর্থ নদী, বাঙ্গালায় 'দরিয়া' শব্দ সমুদ্র অর্থে ব্যবহৃত। কলিকাতা অঞ্চলে অমুকের 'মেয়ে' বলিলে কন্যা বুঝায়, বাঁকুড়া জেলায় স্ত্রী বুঝাইবে। আমরা 'ক্ষীর' বলিলে ঘন দুগ্ধ বুঝি। ভারতের অনেক প্রদেশে পায়স অর্থে 'ক্ষীর' শব্দের ব্যবহার হয়।

(খ) কালগত

এককালে কড়ির দ্বারাই ক্রয় বিক্রয় চলিত। তখন 'কড়ি' শব্দ অর্থরূপে ব্যবহৃত হইত। 'নিকড়ে' শব্দে তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়। এখন 'কড়ি' শব্দ পৃথক্‌ভাবে ব্যবহার করিলে কেবল কপর্দক বুঝায়। 'দুপুর' (দ্বিপ্রহর) বলিলে সাধারণতঃ দিবা দ্বিপ্রহর বুঝায়, কিন্তু মধ্য রাত্রিকে দুপুর রাত বলিলে দোষ হয় না।

কালের সঙ্গে সমাজের সম্বন্ধ খুব নিকট। কালের পরিবর্তনে সামাজিক রীতি-নীতির পরিবর্তন হয়। সুতরাং সামাজিক অনৈক্য আলোচনা প্রসঙ্গে যে উদাহরণগুলি দেওয়া হইয়াছে সেগুলিও এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।

(গ) পাত্রগত

একই শব্দ সকলের কাছে সমান অর্থ বহন করে না। বিদ্যা, বুদ্ধি, সংস্কার, সভ্যতা অনুসারে শব্দের অর্থান্তর ঘটে। 'ধর্ম' শব্দ শুনিলে গ্রাম্য কৃষক তাহার এক ব্যাখ্যা দিবে, নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণের নিকট তাহার অর্থ স্বতন্ত্র, ব্রহ্মবাদীর নিকটে একই শব্দের তৃতীয় অর্থ শুনিতে পাওয়া যাইবে। 'সত্য-মিথ্যা,' 'সুখ-দুঃখ,' 'পাপ পুণ্য,' 'ন্যায়-অন্যায়,' 'দোষ-গুণ,' 'ভাল-মন্দ' প্রভৃতি শব্দের অর্থ সকলের কাছে সমান নয়। সুতরাং জ্ঞান বা বুদ্ধির দ্বারা যে বিষয় অনুভব বা উপলব্ধি করিতে হইবে, সে সকল বিষয়ের অনুভূতির পার্থক্য থাকিবে। আবার জ্ঞান ও বুদ্ধির পার্থক্য যেখানে যত নাই। [illegible] দুঃখাদির ভাব সম্বন্ধেও ধারণা ততই বিভিন্ন।

[illegible] হিংসার বাণী যে সকল ধর্মপ্রচারক প্রথম প্রচার করেন তাঁহাদের [illegible] জীবে দয়া' সম্বন্ধে কিরূপ ধারণা ছিল তাহা প্রাচীন শাস্ত্রাদি হইতে জানা যায়। কিন্তু বর্তমান যুগে যে সকল পুণ্যকামী মৎকুণ-সমাকুল খাটিয়ায় শয়

করিয়া ঐ ক্ষুদ্র জীবগুলিকে স্ব স্ব দেহের শোণিত এবং অষ্টাধিকারিগণকে দক্ষিণা প্রদান করেন তাঁহাদের 'জীবে দয়া' যে কি নিদারুণ তাহা একবার কল্পনা করিয়া দেখিলেই বুঝা যায়। 'সতীত্ব' শব্দের অর্থ অত্যন্ত সংকুচিত হইয়াছে। যদি কোনো নারী বিবাহিত পতি ভিন্ন অপর কোনো পুরুষের অনুরাগিণী না হন—অন্য বহুবিধ দোষ থাকা সত্ত্বেও তিনি 'সতী' হইবেন। তিনি চোর হইলেও 'সতী', মিথ্যাবাদী হইলেও 'সতী', এমন কি পুত্রঘাতিনী হইলেও 'সতী'। আত্মহত্যা মহাপাপ। কিন্তু দেহ পবিত্র রাখার জন্য যে আত্মহত্যা তাহাকে আমরা 'মহাপুণ্য' বলিয়া মনে করি। এইরূপ 'কর্তব্যে'র আদর্শ পাত্রভেদে বিভিন্ন। 'সৌন্দর্যে'র আদর্শ রুচিভেদে বিভিন্ন। মনুষ্যত্বে'র আদর্শ মনুষ্যভেদে বিভিন্ন।

(ঘ) সমাজগত

সামাজিক আচার ব্যবহার সকল দেশে এক প্রকার নয়। সেইজন্য সম্বন্ধবাচক শব্দের অর্থ ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন রকম। ভারতবর্ষে কোনো ব্যক্তি অপরিচিতা কোনো স্ত্রীলোককে 'মা' বলিয়া সম্বোধন করিলে কিছুমাত্র অস্বাভাবিক মনে হয় না। এখানে মাতৃ শব্দের ব্যবহার খুব ব্যাপক। আমরা 'ভাই' বলিলে কেবল ভাইকে বুঝি না। বাঙ্গালার পল্লীগ্রামে 'বাবু' ও 'ভাই' এই দুই সম্বন্ধে পল্লীবাসীরা প্রত্যেক ব্যক্তিকেই আপন করিয়া লয়। ইংরাজী brother শব্দও শুধু সহোদর অর্থে ব্যবহৃত হয় না। ইহা এক সম্প্রদায়ভুক্ত লোককেও বুঝায়। 'শালা' সম্বন্ধ এদেশে পরিহাসের সম্বন্ধ। 'শালা' বলিয়া পরিহাস করিতে করিতে উহা ক্রমশঃ গালাগালিতে পরিণত হইয়াছে। গালাগালিতে পরিণত হইবারও একটা কারণ আছে। এই শব্দটির মধ্যে একটি আত্মাবমাননার ভাব আছে। আমাদের দেশে কন্যাগ্রহণ করাটাই গৌরবের কাজ। কন্যা যে দেয় সে যেন মহা অপরাধী। তাই যখন 'শালা' বলি তখন উদ্দিষ্ট ব্যক্তির ভগ্নীকে গ্রহণ করিয়াছি এইরূপ মনোভাববশতঃ নিজে গৌরব বোধ করি এবং উদ্দিষ্ট ব্যক্তি লজ্জা ও সংকোচ বোধ করে। পূর্ববঙ্গে পরস্পরের মধ্যে 'বেটা' শব্দের যথেষ্ট ব্যবহার করিয়া থাকেন। পশ্চিমবঙ্গে 'বেটা' শব্দের এরূপ ব্যবহার করিলে সাধারণের রুচিকে আঘাত করা হইবে 'শালা' শব্দ বাঙ্গালাদেশে গালিবাচক শব্দরূপে ব্যবহৃত হইতে

হইতে এমন অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে যে, এখন পরিচয় দিবার সময়ও অনেকে এই শব্দ উচ্চারণ করিতে লজ্জা বোধ করেন। সম্ভবত ইহার ফলেই 'সম্বন্ধী' শব্দের এত বেশী প্রচলন। 'শালা'র অর্থ বদলাইয়াছে বলিয়া 'সম্বন্ধী'র অর্থও বদলাইয়া গেল। আমার জনৈক অবাঙ্গালী বন্ধু কোনো ভদ্রলোকের নাম করিয়া একদিন আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে সেই ভদ্রলোক আমার সম্বন্ধী কি না। সে ভদ্রলোকের যে বয়স তাহাতে তাঁহার পক্ষে আমার শ্যালক হওয়া অসম্ভব, তাই বন্ধুর কথাকে অভদ্রজনোচিত পরিহাস বলিয়াই প্রথমে ভাবিয়াছিলাম। পরে বুঝিলাম তিনি নির্দোষ। 'সম্বন্ধী' শব্দ তিনি আত্মীয় অর্থে ব্যবহার করিয়াছিলেন।

'বউ' শব্দের অর্থ নব-বিবাহিতা কন্যা। কিন্তু 'বউ' শব্দের ব্যবহার শ্বশুরালয়ে অথবা শ্বশুরের দেশে সীমাবদ্ধ। পিত্রালয়ে কোনো কন্যাই 'বউ' নয়, সকলেই 'ঝি'। বিবাহিতা কন্যা এই অর্থ হইতে বউ শব্দ স্ত্রী অর্থও গ্রহণ করিয়াছে। শ্বশুর পুত্রবধূকে 'বউমা' বলেন। আবার জ্যেষ্ঠভ্রাতা পিতৃ-তুল্য বলিয়া ভাশুরও ভ্রাতৃবধূকে 'বউমা' বলিয়া সম্বোধন করেন। অবিবহিতা কন্যা পিত্রালয়ে 'ঠাকুর' বলিলে দেবতা বা ব্রাহ্মণকে বুঝাইবে। কিন্তু শ্বশুরালয়ে 'ঠাকুর' শব্দে শ্বশুরকেও বুঝাইতে পারে। ঠাকুরপো বা ঠাকুরঝি শব্দে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। আজকাল অবশ্য শ্বশুরকেও পুত্রবধূরা 'বাবা' বলিয়া থাকেন। ভাশুর সম্মানে শ্বশুরের সমান, তাই তাঁহাকেও 'ঠাকুর' বলার রীতি ছিল এবং এখনও আছে। বট্‌ঠাকুর (বড় ঠাকুর), মেজঠাকুর প্রভৃতি আখ্যায় ভাশুরদের উল্লেখ করা হয়।

জ্যেষ্ঠতাত বাড়ীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা সম্মানিত। পিতাও তাঁহাকে মান্য করেন। ঠাকুরদাদা বয়সে সকলের চেয়ে বড় হইতে পারেন কিন্তু তাঁহার সহিত যে সম্বন্ধ সে কেবল আব্দারের। তাঁহাকে ভয় না করিলেও চলে। কিন্তু জ্যেঠামহাশয়ের সহিত সেরূপ সম্বন্ধ নয়। এই জন্যই কোনো ছোট ছেলের মুখে বড় কথা শুনিলে তাহাকে 'জ্যেঠা' ছেলে বলি।

এককালে কন্যা নিজে পাত্র পছন্দ করিয়া তাঁহাকে বরণ করিয়া লইতেন, সেইজন্য পাত্রের নাম হইয়াছিল বর। কিন্তু এযুগে পাত্রই কন্যা পছন্দ করিয়া বিবাহ করিতেছেন। প্রথা বদলাইয়া গিয়াছে, কাজেই বর শব্দের অর্থও পরিবর্তিত হইয়াছে।

(ঙ) বস্তুগত

আমরা প্রতিনিয়ত যে সকল দ্রব্য ব্যবহার করি তাহাদের আক্ষরিক এবং উদ্দিষ্ট অর্থ বিচার করিয়া দেখিলে শব্দ পরিবর্তনের আর একটি বিশেষ কারণ দেখা যাইবে।

'কাপড়' শব্দ প্রথমে কার্পাসজাত বস্ত্রকেই বুঝাইত। কিন্তু এখন আমরা রেশমী বস্ত্রকে 'রেশমী কাপড়' এবং পশমী বস্ত্রকে 'পশমী কাপড়' বলি। উপাদান নূতন হইয়াছে কিন্তু পুরাতন উপাদানের নাম বদলায় নাই। আজকাল সধবা স্ত্রীলোকগণ 'সোনার নোয়া' পরিয়া থাকেন। আমরা 'কাঁসার গেলাসে' জল খাই। 'ঘড়ি' বা 'ঘড়ী' শব্দের অর্থ, সময় নিরূপণের যন্ত্র-বিশেষ। এই নামের পশ্চাতে একটি ইতিহাস আছে। প্রাচীনকালে ছিদ্রযুক্ত ঘটে বালুকা বা জল রাখিয়া সময় নিরূপণ করা যাইত। এইরূপ ঘটকে ঘটীযন্ত্র বলা হইত। এইরূপে 'ঘটী' শব্দের সঙ্গে সময়জ্ঞাপকতা ভাবের একটা সংযোগ স্থাপিত হইয়া গেল। তাহার ফলে শুধু 'ঘটী' শব্দই কালনিরূপক যন্ত্র অর্থে ব্যবহৃত হইতে লাগিল[২৫]। বর্তমান যুগে বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে স্প্রিংয়ের সময় নিরূপক যন্ত্র ঘটীকে অপসারিত করিয়া দিয়াছে। কিন্তু তাহার নামটি নিজে অধিকার করিয়া বসিয়াছে। 'ঘড়ি' ঘটির রূপান্তর হইলেও তাহার অবয়বগত কোনো সাদৃশ্যই ইহাতে নাই। তখনকার দিনে 'ঘটী'কে ট্যাঁকে গুঁজিয়া লইয়া যাইবার কথা কেহ কল্পনাও করিত না। আজকাল আমরা 'হাতঘড়ি' 'ট্যাঁকঘড়ি' স্বচ্ছন্দে বহন করি। ফারসী 'পোলাও' শব্দে মাংসমিশ্রিত ভাত বুঝায় কিন্তু আমরা যে 'ছানার পোলাও' খাই তাহাতে ভাতের বা মাংসের কোনো সংস্রব নাই। 'ঘৃত' বলিলে গবাদি পশুর দুগ্ধজাত এক প্রকার স্নেহদ্রব্যকে বুঝায়, কিন্তু 'ভেজিটেবল ঘি' যে সম্পূর্ণ নিরামিষ তাহা সকলেই জানেন। 'তুলি' দিয়া চিত্রকর ছবি আঁকেন তাহা কোনো কালে হয়ত তুলার দ্বারা প্রস্তুত হইত কিন্তু এখন উহা পশুলোমে নির্মিত হয়, তুলার সহিত উহার কোনো সম্বন্ধ নাই। তৈলসিক্ত কাপড়ের পলিতা দিয়া প্রদীপ জ্বালাইবার প্রথা অতি পুরাতন। ঐ পলিতার নাম 'বাতি'। সংস্কৃত বর্তিকা হইতে বাতির উৎপত্তি। 'বাতি' শব্দ ক্রমশঃ [বর্তিকা] পলিতা

২৫. নির্দিষ্ট সময়ে যে পুরু কাংস্যময় পাত্রে হাতুড়ির ঘা দিয়া বাজানো হয় তাহারও নাম 'ঘড়ি'। ক্লক সময় নিরূপণও করে এবং ঘণ্টায় ঘণ্টায় বাজিয়াও থাকে। সুতরাং তাহার পক্ষে 'ঘড়ি' নামটি গ্রহণ করা আরও সহজ হইল।

হইতে প্রদীপ অর্থ গ্রহণ করিল। উহা হইতে আমরা বৈদ্যুতিক আলোকেও 'বাতি' বলিতে আরম্ভ করিয়াছি। হিন্দীতেও 'বিজলী বত্তী' বলে।

মোটরগাড়ীর প্রচলনের পূর্বে লোকে ঘোড়ার গাড়ী 'হাঁকাইয়া' চলিত। মোটরে 'হাঁক' দিবার কোনো প্রয়োজন হয় না, তথাপি বড়লোকে মোটর 'হাঁকাইয়া' চলেন। ইংরাজিতেও রেল, মোটর প্রভৃতি যন্ত্রযানের চালনা সম্বন্ধে drive শব্দের প্রয়োগ অনেকটা ঐ প্রকারের।

৬. ভা বা বে গ

'মারাত্মক' অপরাধ, 'অসম্ভব' কথা, 'অদ্ভুত' আচরণ, 'ভীষণ' সমস্যা, 'ভয়ংকর' গোলমাল প্রভৃতি কথায় বিশেষণগুলির আক্ষরিক অর্থ যত 'ভয়ানক'— ব্যবহারিক অর্থ তত নহে। আমরা স্বভাবতঃই সব কথাকে কিছু অতিরঞ্জিত করিয়া বলিতে চাই। ক্রোধ, ভয়, আনন্দ, বিরক্তি প্রভৃতি ভাবের আতিশয্য ঘটিলে এইরূপ অতিরঞ্জনের প্রবৃত্তি আরও বৃদ্ধি পায়। তাহারই ফলে উল্লিখিত প্রকারের শব্দসমূহের অর্থ পরিবর্তিত হইয়া যায়। সন্দেশটা কি 'ভীষণ' মিষ্টি! ছেলেটা 'ভয়ানক' দুর্দান্ত হয়েছে! এই ধরণের প্রয়োগ সচরাচর শোনা যায়।

যিনি পত্নীর উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলেন, তোমার হাতে যদি জল খাই তো 'আমার নামই অমুক নয়', তাঁহার নাম প্রকৃতই যে বদলাইয়া যায় তাহা নহে, যদিচ পত্নীর হাতের জল রাগ পড়িয়া গেলেই তিনি পান করেন। এই সকল শপথবাক্যের যে জোর, অতিব্যবহারের ফলে তাহা কমিয়া যায়। 'মা কালীর দিব্যি.' 'মাইরি' প্রভৃতি যে সব শপথবাক্য পথে-ঘাটে শুনিতে পাওয়া যায়, উহাদের উপর আস্থা স্থাপন করে কয়জন?

লোকটা 'দারুণ' খাওয়া খেয়েছে বলিলে 'দারুণ' শব্দের আক্ষরিক অর্থ রক্ষিত হয় না। মারের চোটে 'পিতার নাম ভুলাইয়া দিবার' কথা তথা-কথিত ভদ্রলোকের মুখেও শোনা যায়। "এসেছ?—তবে আর কি?— একেবারে আমার মাথা কিনেছ।" "কি করবে?—এই আমার শ্রাদ্ধ!" "কচুপোড়া খাও"! প্রভৃতি বাক্যে ক্রোধবশতঃ যে সব কথার ব্যবহার হইয়াছে যথা-অর্থে সেগুলির প্রয়োগ হয় নাই। অতএব বিস্ময়াদি ভাবের

উচ্ছ্বাসে যে সকল বাক্য বা শব্দ প্রয়োগ করা হয়, সেই বিজল্পিত বচনগুলিকে কেহ যেন সর্বত্র পরমার্থরূপে গ্রহণ না করেন।

৭. ব্যষ্টিস্থলে সমষ্টি

সন্ধ্যার মূল অর্থ সন্ধিকাল। প্রাতঃ সন্ধ্যা, মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা, সায়ং সন্ধ্যা প্রভৃতি কথায় সেই মূল অর্থই রক্ষিত হইয়াছে। দুই 'সন্ধ্যা' দুই মুঠা খাই— এরূপ প্রয়োগও বিরল নহে। কিন্তু শুধু 'সন্ধ্যা' বলিলে এখন আমরা কেবল দিবা ও রাত্রির সন্ধিকালকেই বুঝি। এই অর্থে সন্ধ্যা শব্দের সমধিক ব্যবহার উহার অর্থের সংকোচসাধন করিয়াছে। লিখিবার জন্য আমরা যে 'কালি' ব্যবহার করি তাহা সাধারণতঃ কৃষ্ণবর্ণ—এই কাল রংয়ের জন্যই উহার 'কালি' নামকরণ, যদিচ লিখিবার কালি ছাড়াও অনেক বস্তুরই রঙ্ কাল[২৬]। মহারাষ্ট্র রাজপুতানা প্রভৃতি অঞ্চলে স্ত্রীলোকের নামের সহিত 'বাঈ' শব্দ যোগ করার রীতি আছে[২৭]। যেমন, মীরাবাঈ, অহল্যাবাঈ ইত্যাদি। ঐ সকল দেশের নর্তকীরাও দেশাচার অনুসারে নিজ নিজ নামের সহিত 'বাঈ' শব্দ যোগ করেন। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের যে সকল পেশাদার নর্তকী বাঙ্গালাদেশে আসিয়া নৃত্য গীতের দ্বারা অর্থোপার্জন করিতেন তাঁহারা ঐ কারণে 'বাঈ' নামেই পরিচিত হন। 'বাইনাচ' অথবা 'বাইজি নাচ' শব্দে তাহা লক্ষ্য করা যায়। 'বাই' বলিলে প্রকৃতপক্ষে ঐ সব দেশের সকল রমণীকেই বুঝানো উচিত। কিন্তু বাঙ্গালা দেশের সহিত তত্তৎদেশের রমণীসমাজের সম্যক্ পরিচয় ছিল না। বাঙ্গালাদেশ উত্তর পশ্চিমের নারী জাতির একটি সম্প্রদায়কে মাত্র দেখিয়াছিল। সুতরাং সেই সম্প্রদায়ের সহিত যুক্ত যে পদবী, তাহা কেবল সেই সম্প্রদায়েরই পদবী বলিয়া মনে করিয়াছে। 'লালপানি' বলিলে রক্তবর্ণ জলমাত্রকেই বুঝানো উচিত, কিন্তু তাহা না বুঝাইয়া উহা রক্তবর্ণের তরল পদার্থবিশেষকেই বুঝায়।

২৬. এই প্রসঙ্গে 'সমষ্টিস্থলে ব্যষ্টি' শীর্ষক অধ্যায়ও দ্রষ্টব্য।

২৭. যেমন আমরা 'দেবী' যোগ করি।

৮. সমষ্টিস্থলে ব্যষ্টি

অনেকের দ্বারা যেমন একের অর্থ প্রকাশিত হয় তেমনি একের দ্বারাও অনেকের অর্থ সূচিত হয়। 'কালি' শব্দের অর্থ কৃষ্ণবর্ণ তরলপদার্থ বিশেষ। কিন্তু লাল নীল সবুজ প্রভৃতি যে কোনো রঙের তরল পদার্থকেই আমরা 'কালি' আখ্যা দিই। 'বাই' শব্দে এক সম্প্রদায়ের নর্তকী বুঝায়। কিন্তু আমরা বাঙ্গালী নর্তকীর নাচকেও 'বাইনাচ' বলি। হিন্দী 'ঢব' শব্দে এক প্রকার চর্মাচ্ছাদিত বাদ্যযন্ত্র বুঝায়। ইহার সহযোগে গীত হইবার জন্য এক প্রকার সংগীতের নাম হইল 'ঢব্' বা 'ঢপ্' সংগীত। তাহা হইতে অন্যান্য আরও কয়েক প্রকারের সংগীতের 'ঢপ' সংগীত নাম হইয়াছে, যদিচ সে সকল সংগীতে 'ঢপ্' যন্ত্র ব্যবহার হয় না। বাঙ্গালা দেশের পুলিস্ কনস্টেবলরা কোট, হাফ্ প্যান্ট এবং লাল পাগড়ি পরে। কিন্তু শিরোভূষণটির প্রতিই আমাদের দৃষ্টি বিশেষরূপে আকৃষ্ট হয়। তাই আমরা 'লাল পাগড়ি' বলিয়া পুলিস কনস্টেবল্ বুঝাই। তাহা হইতে 'লাল পাগড়ি' শব্দ আরও ব্যাপকভাবে পুলিস কর্মচারী-মাত্রকেই বুঝায়। অথচ সকল পুলিস কর্মচারীই যে লাল পাগড়ি পরে তাহা নয়। তথাপি 'লাল পাগড়ি' বলিলে সকলের কথাই মনে পড়ে। পুলিস বিভাগের মধ্যে 'লাল পাগড়ি' পরিহিত ব্যক্তিদের সহিতই আমাদের পরিচয় বেশী। পথে বাহির হইলেই তাহাদের দর্শন মিলে। এই জন্যই অর্থের প্রসার এবং আরোপ দুইই হইয়াছে।

(ক) দেহের পরিবর্তে অঙ্গের নাম

প্রধান অঙ্গবিশেষের নাম করিয়া অনেক সময় সমগ্র দেহকে বুঝানো হয়। এই ধরণের অর্থ-পরিবর্তনও কতকটা উপরিউক্ত শ্রেণীর অনুরূপ।

আমরা যখন কাহারও 'শ্রীচরণ' দর্শন মানসে অত্যন্ত উৎসুক হইয়া পড়ি তখন শুধু শ্রীচরণ দুইটিই দেখিতে চাই না। রাগ করিয়া যাহার 'মুখ' দেখিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করি সে যদি মুখ ঢাকিয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায় তাহা হইলে রাগ বাড়ে বই কমে না। যাঁহার 'পাণি' প্রার্থনা করি তাঁহাকে সম্পূর্ণ এবং সমগ্রভাবেই কামনা করি। হাফিজ কি সত্য সত্যই শুধু প্রিয়ার গালের 'কৃষ্ণ তিলটি'র মূল্যস্বরূপই সমরকন্দ আর বোখারা দিবার প্রস্তাব

করিয়াছিলেন? দীন দরিদ্রের বাড়ীতে যখন বড়লোক 'পা'য়ের ধুলা দেন তখন সশরীরে আসিয়াই দেন, লোক মারফত প্রেরণ করেন না।

(খ) এক ঘটনার দ্বারা আনুষঙ্গিক অন্যান্য ঘটনা সম্বন্ধে ইঙ্গিত

অঙ্গবিশেষের দ্বারা যেমন সমস্ত দেহ সূচিত হয়, তেমনি প্রধান বস্তু বিশেষের দ্বারা আনুষঙ্গিক অনেক বস্তুকেই বুঝায়। এক ঘটনা তৎসম্পৃক্ত অন্যান্য ঘটনার কথা প্রকাশ করে।

আমরা 'পান' খাই বলি, কিন্তু চুন খয়ের সুপারির কথা উহ্য রাখি। 'ভাত' খাইয়াছি বলিলে ডাল তরকারিও খাইয়াছি ধরিতে হইবে।

'লালবাতি জ্বালা'র অর্থ দেউলিয়া হওয়া। 'ধামা ধরা'র অর্থ খোশামোদ করা। 'পায়ে পড়া'র অর্থ মিনতি করা।

৯. অনবধানতা

অজ্ঞতা ও অনবধানতা হেতু শব্দের নানাবিধ অপপ্রয়োগ এবং অর্থান্তর ঘটে। ঔদাসীন্য অথবা প্রয়োগকারীর প্রতি সম্ভ্রমবশতঃ জনসাধারণ অনেক সময় তাহা মানিয়া লয়। 'অবদান' শব্দ তাহার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বায়স্কোপ্ কোম্পানির নবতম 'অবদান' আজকাল প্রায়ই বিজ্ঞাপিত হইয়া থাকে।

আমরা 'সুতরাং' 'তথাচ' 'হঠাৎ' প্রভৃতি যে সকল সংস্কৃত অব্যয় ব্যবহার করি তাহাদের অধিকাংশই মূল অর্থ হারাইয়া নূতন অর্থ গ্রহণ করিয়াছে। সংস্কৃতে 'এবম্' শব্দের অর্থ এইরূপ, বাঙ্গালায় 'এবং' ঐ অর্থে ব্যবহৃত হয় না। যে বেদকে আপ্তবাক্য বলিয়া মানে না অথবা ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিশ্বাস করে না তাহাকেই 'নাস্তিক' বলা হইত। কিন্তু এখন যে ব্যক্তি দেশাচার মানে না তাহাকেও নাস্তিক বলা হয়। 'ম্লেচ্ছ' শব্দ প্রথমে কোনো বিশেষ জাতি এবং দেশ অর্থে ব্যবহৃত হইত। এখন 'ম্লেচ্ছ' বলিলে কদাচারী বুঝায়। 'পাষণ্ড' শব্দে এক সম্প্রদায়ের বৌদ্ধ সন্ন্যাসীকে বুঝাইত। কিন্তু এখন উহার অর্থ হইয়াছে নিষ্ঠুর। 'বুজরুক' (ফারসী বুজুর্গ) শব্দটি বাঙ্গালায় কিরূপ অর্থান্তর লাভ করিয়াছে তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। 'পায়নাফুলি' নামে একপ্রকার নক্সা-

ওয়ালা শাড়ি বাজারে পাওয়া যায়। 'শেওড়াফুলি' 'বেগুনফুলি' প্রভৃতির সাদৃশ্যে লোকে 'পায়নাফুলি'কে এক প্রকার অপরিচিত ফুল বলিয়াই মনে করে কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নয়। ঐ শব্দটি ইংরাজি pine-apple-এর অপভ্রংশ। কাঠের এবং লোহার মিস্ত্রীরা ইংরাজি rivet শব্দের স্থানে 'রিপিট' উচ্চারণ করে। 'রিপিট' (repeat) কথার মূল অর্থ যাহাই হউক না কেন, মিস্ত্রী সমাজে উহার অর্থ লইয়া কখনও অনর্থ বাধিবে না। আমরা 'আরাম চেয়ারে' (arm-chair) বসিয়া বসিয়া এমনই আরামে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি যে, উহার arm (হাত রাখিবার স্থান) দুইটি আছে কিনা সে দিকে দৃক্‌পাত করি না। তাই arm বিহীন চেয়ারকেও 'আরাম চেয়ার' বলি।

কিছুদিন আগেও চিঠিপত্রে বিধবা বুঝাইতে স্ত্রীলোকের নামের শেষে 'দেব্যাঃ' (ব্রাহ্মণের পক্ষে) এবং 'দাস্যাঃ' (শূদ্রের পক্ষে) লেখার রীতি ছিল। আইনসংক্রান্ত দলিলপত্রে এখনও এ রীতি বর্তমান আছে দেখা যায়। এই রীতির মূলে একটি ইতিহাস আছে[২৮]।

২৮. অমুকের লেখা এই অর্থে ষষ্ঠী বিভক্তির ব্যবহার। এখনও পর্যন্ত ব্রাহ্মণেরা অমুক শর্মণঃ বলিয়া অনেক লেখার শেষে নাম স্বাক্ষর করেন। 'দেব্যাঃ' 'দাস্যাঃ' পদবীর মূলেও ঐ ব্যাপার। কিন্তু কেবল বিধবার নামের সঙ্গে ইহার যোগ হইল কেন? সধবা ও কুমারীর নামের সহিতও তো হইতে পারিত?

বাঙ্গালী স্ত্রীলোকদের মধ্যে লেখাপড়ার প্রচলন পূর্বকালে ছিল না বলিলেই হয়। যাহা ছিল তাহাও নিতান্ত অল্প। সুতরাং স্ত্রীলোকেরা চিঠিপত্র একরকম লিখিতেনই না। লিখিবার দরকারও হইত না। কেবল পতিপুত্রহীনা অনাথাদের সম্পত্তিরক্ষার জন্য কাগজ পত্র লিখিতে (অধিকাংশ ক্ষেত্রে লেখাইতে) হইত। দলিল পত্রে তাঁহাদের নাম উল্লেখ করিবার বেশী প্রয়োজন হইত। পুরুষের পদবী (শর্মণঃ, দাসস্য প্রভৃতি)-র নজিরে তাঁহাদের নামের শেষে 'দেব্যাঃ' ও 'দাস্যাঃ' লেখা হইতে লাগিল। কিন্তু বিধবার নামই অধিক লিখিত হওয়ায় এই পদবীগুলি বিধবার পদবী বলিয়াই অনুমিত হইয়া গেল। পরে সধবা ও কুমারীরা যখন লিখিতে আরম্ভ করিলেন তখন 'দেব্যাঃ' ও 'দাস্যাঃ' হইতে পৃথক করিয়া 'দেবী' ও 'দাসী' শব্দ বিনা বিভক্তিতেই ব্যবহার করিতে লাগিলেন। এখন 'দাসী' উঠিতে বসিয়াছে, দাসপত্নীও 'দাসী' হইতে লজ্জাবোধ করেন। ফলে 'দাস্যাঃ'ও বিরল হইয়াছে। এখন অদেবপত্নী রমণীরাও 'দেবী', যাঁহারা দেবপত্নী তাঁহাদের তো কথাই নাই। ফলে 'দেবী' পদবীর ব্যবহার বাড়িয়াছে। তাই 'দেব্যাঃ' এখনও সম্পূর্ণ লোপ পায় নাই।

১০. অর্থ সৃষ্টি

শুধু অনবধানতা বা অজ্ঞতা নয়, লেখকের বা প্রয়োগকর্তার স্বেচ্ছাচারিতাও অনেক সময় অর্থপরিবর্তনের জন্য দায়ী হয়।

'বারুণী' শব্দের এক অর্থ ; কিন্তু জানিয়া শুনিয়াও মধুসূদন ঐ শব্দকে কেবল শ্রুতিমধুর হইবে বলিয়া বরুণের স্ত্রী অর্থে প্রয়োগ করিলেন।

'প্রদোষ' শব্দের অর্থ রজনীমুখ, কিন্তু উষাকাল অর্থেও রবীন্দ্রনাথ ঐ শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন।

জানালা (পর্তুগীজ জানেলা) শব্দের ধ্বনিসাম্যে এবং বাতায়নের আকৃতি অনুসারে রবীন্দ্রনাথ 'জালায়ন' শব্দ চয়ন করিয়াছেন। জালনির্মিত অয়ন অর্থাৎ গতিপথ এই ব্যাস বাক্যে জালায়ন শব্দের সমাস নিষ্পন্ন করিলে উহার আক্ষরিক অর্থ হয় জাল বা জালের রাস্তা। তাহা হইতে উহার গবাক্ষ এই অর্থ দিয়াছেন।

স্বেচ্ছাচারমাত্রই নিন্দনীয় নয়। এইরূপ নূতন শব্দ সৃষ্টির ফলে ভাষার সম্পদ্ বৃদ্ধি পাইবে।

১১. অর্থের অনির্দিষ্টতা

এমন অনেক শব্দ আছে যাহারা বিশেষ একটা সুনির্দিষ্ট অর্থ প্রকাশ করে না। 'ভদ্রলোক' ও 'ভদ্রমহিলা' এই শব্দদ্বয় ইংরাজী gentleman ও lady এই দুই শব্দের প্রতিশব্দরূপে ব্যবহৃত হয়। ইংরাজী শব্দ দুইটির ব্যবহার যেমন অত্যন্ত ব্যাপক, বাঙ্গালা শব্দ দুইটিরও তেমনই। সুতরাং 'ভদ্রলোক' বলিলে ভদ্রাভদ্র সকলকেই বুঝায়। 'ভদ্র' শব্দের আক্ষরিক যে অর্থ 'ভদ্রলোকে' তাহা রক্ষিত না হইয়া পরিবর্তিত হইয়াছে। বাঙ্গালা সাহিত্যে যে সকল রাজাকে 'পঞ্চগৌড়েশ্বর' আখ্যায় অভিহিত করা হইয়াছে তাঁহাদিগের অনেকের রাজত্ব হয়তো পঞ্চগ্রামের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। রাজচরিত্রের বর্ণনায় শুধু বাঙ্গালী কবিরাই যে এইরূপ অর্থহীন বিশেষণ প্রয়োগ করিয়াছেন তাহা নহে, প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যেও এইরূপ শব্দাড়ম্বরের প্রাচুর্য দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার "কাদম্বরী চরিত্র" সমালোচনায় ইহা লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন "যদিও সত্যের অনুরোধে বলিতে হইয়াছে শূদ্রক বিদিশা-

নগরীর রাজা, কিন্তু অপ্রতিহতগামী ভাষা ও ভাবের অনুরোধে বলিতে হইয়াছে, তিনি—চতুরুদধিমালামেখলায়া ভুবোভর্তা।” আবার সেকালের কবিরা চাটুকারিতায় যেমন মুক্তকণ্ঠ ছিলেন, নৃপতিবর্গও উপাধি বিতরণে তেমনি অকৃপণ ছিলেন। কিন্তু সেই সকল উপাধির দ্বারা উপাধিধারীর বৈদগ্ধ্যের পরিমাণ যথাযথভাবে নিরূপণ করা যায় না। কবিকঙ্কণ, রায়গুণাকর, বিদ্যাদিগ্‌গজ, বাচস্পতি প্রভৃতি উপাধিই তাহার সাক্ষ্য।

রাজদত্ত উপাধি অনেক সময় বংশপরম্পরাক্রমে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং সেই সব শব্দের আক্ষরিক অর্থ যাহাই হউক না কেন, কার্যতঃ সেগুলি কেবল কোনো বিশেষ বংশ বা পরিবারের পরিচয় দিয়া থাকে। চক্রবর্তী পদবীধারী অনেক লোক আছেন যাঁহারা দুইবেলা দুই মুঠা অন্নের সংস্থানও করিতে পারেন না। বংশের কোনো ব্যক্তি অগাধ পাণ্ডিত্যবশতঃ হয়ত 'পণ্ডিত' উপাধি পাইয়াছিলেন। বংশধরেরা তাঁহার গুণ পাইল না কিন্তু উপাধিটি পৈতৃক সম্পত্তির সহিত অধিকার করিয়া রহিল। কাজেই তাহারা না পড়িয়াও 'পণ্ডিত' হইল। 'মজুমদার' শব্দের অর্থ রাজস্বের হিসাবরক্ষক। মুসলমান আমলে যাঁহারা রাজসরকারে ঐ কর্ম করিতেন তাঁহারা 'মজুমদার' বলিয়াই অভিহিত হইতেন। তাহা হইতে উহা 'কুলপদবী'-রূপে বংশানুক্রমে ব্যবহৃত হইতে লাগিল। সুতরাং অর্থ পরিবর্তিত হইল।

'বিলাত' শব্দের অর্থ বিদেশ। তাহা হইতে উহা ইংলণ্ড অথবা আরও ব্যাপকভাবে ইউরোপকেও বুঝায়। আবার 'বিলাতী' জিনিস বলিলে প্রধানতঃ ব্রিটিশ দ্রব্যকে বুঝায়। জাপানী জিনিস বিলাতী নয়, কিন্তু টম্যাটোর নাম 'বিলাতী' বেগুন। গোল আলুকেও অনেক সময় 'বিলাতী' আলু বলা হয়।

আজকাল ইংরাজী friend শব্দের অনুকরণে 'বন্ধু' শব্দটা খুব প্রচলিত হইয়া গিয়াছে। প্রবীণ অধ্যাপকও ইউরোপীয় প্রথায় নবীন ছাত্রকে বন্ধু বলিয়া সম্বোধন করেন। বিলাতী আদব-কায়দার প্রভাবে 'বন্ধু' শব্দের অর্থ অতিবিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং অমুক অমুকের 'বন্ধু'—এই কথা বলিলে তাঁহাদের মধ্যে সম্প্রীতিবন্ধন থাকিতেই হইবে, এরূপ মনে করিবার কোনো কারণ নাই।

কিছুদিন আগেও বাঙ্গালা দেশে কেবল ব্রাহ্মণজাতীয় স্ত্রীলোকগণই নামের শেষে 'দেবী' লিখিতেন। এখন 'দেবী' শব্দের ব্যবহার জাতিবিশেষে

নিবদ্ধ নহে। ভারতের প্রায় সকল প্রদেশের রমণীরাই আজকাল নামের শেষে 'দেবী' লিখিতেছেন। এখন থিয়েটার বায়স্কোপের অভিনেত্রীরাও দেবী। বিদেশী মহিলারাও মধ্যে মধ্যে শখের ভারতীয় নাম লইয়া প্রান্তে একটি 'দেবী' সংলগ্ন করেন। ইংরাজীতে নামের শেষে যে Esq. লেখা হয় তাহাও প্রথমে আমাদের 'দেবী'র মতই সমাজের একটা বিশেষ সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের লোকের পক্ষেই প্রযুক্ত হইত। কিন্তু এখন Esq.-এর গৌরব এদেশীয় 'দেবী'র মতই একাকার হইয়া গিয়াছে।

'খাওয়া' ধাতুর মূল অর্থ ভোজন করা। কিন্তু ইহার অর্থ ক্রমশঃ কিরূপ সীমাহীন ব্যাপ্তি লাভ করিয়াছে দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। খাবি, মাথা, মার, ধাক্কা, হোঁচট, ঘুষ এমন কি ঘণ্টা পর্যন্ত খাইবার ব্যবস্থাও বাঙ্গালা ভাষায় আছে।

'লাগা'র অর্থ সংলগ্ন হওয়া। কিন্তু রসগোল্লা যখন মিষ্টি 'লাগে' এবং মেয়েটিকে যখন মন্দ 'লাগে' না, তখন অর্থ সুদূরবিস্তৃত হইয়া পড়ে।

১২. গৌণার্থপ্রাধান্য

শব্দের প্রধান অর্থের সঙ্গে সঙ্গে কখনো কখনো এক বা একাধিক গৌণ অর্থও দেখা দেয় এবং সেই গৌণ অর্থ ভাষায় চলিত হইয়া যায়।

'মোট কথা' শব্দে মোটের অর্থ বোঝা যায়। ইহার অর্থ হইতেছে এই যে, যতগুলি কথা বলা হইয়াছে তাহার অপ্রয়োজনীয় অংশ বাদ দিয়া সারাংশ যতটুকু, কেবল সেইটুকুই। 'মোট' শব্দের মূল অর্থ 'সমষ্টি,' কিন্তু গৌণ অর্থ অত্যাবশ্যক।

'মন্দির' শব্দের মূল অর্থ 'গৃহ'। কিন্তু এখন কেবল 'দেবালয়' অর্থেই ইহার ব্যবহার একরূপ সীমাবদ্ধ হইয়া গিয়াছে।

'বাসর' (<বাসহর < বাসঘর < বাসগৃহ) শব্দের অর্থ থাকিবার ঘর। তাহা হইতে ইহার অর্থ হইল, বরবধূ প্রথম যে কক্ষে শয়ন করে সেই কক্ষ।

'হিন্দু' শব্দটি সিন্ধু শব্দজাত। প্রাচীন পারসীকগণ সিন্ধুকে 'হিন্দ্' বা 'হিন্দু'[২৯] বলিতেন। তাহা হইতে সিন্ধু নদী যে প্রদেশে প্রবাহিত তাহার নাম হইল 'হিন্দু' এবং তদ্দেশের অধিবাসীরা 'হিন্দু' নামেই পরিচিত হইল। ফারসী

ভাষায় 'হিন্দু' শব্দ 'কৃষ্ণবর্ণ' অর্থেও প্রযুক্ত হয়। ভারতে মুসলমান রাজত্বের প্রাক্কালে অনেক ভারতীয়কে বন্দী করিয়া পারস্যে লইয়া যাওয়া হয় এবং সেখানে দাসরূপে বিক্রয় করা হয়। তাহার ফলে ফারসীতে 'হিন্দু' শব্দ ক্রীতদাস অর্থেও প্রযুক্ত হইতে লাগিল। 'হিন্দু' শব্দ যে প্রথমে সিন্ধুপ্রদেশ অর্থাৎ ভারতবর্ষ অর্থে প্রযুক্ত হইত তাহার প্রমাণ অনেক স্থলে পাওয়া যায়। কিন্তু দেশ অর্থে 'হিন্দু' শব্দ ক্রমশঃ অপ্রচলিত হইয়া গেল, তাহার ফলে আবার নূতন করিয়া 'হিন্দুস্থান' শব্দের উৎপত্তি। 'হিন্দুস্থান' শব্দের আক্ষরিক অর্থ—হিন্দে যাহারা বাস করে তাহাদের দেশ। সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রমতে 'ভবানীপতি' লিখিলে যে দোষ হয় ইহারও সেই দোষ।

যে কারণগুলি উল্লিখিত হইল উহাদের শ্রেণীবিভাগ সুসম্পূর্ণ হইতে পারে না। প্রধান কারণগুলিকে যতদূর সুশৃঙ্খলভাবে পারা যায় সাজাইবার চেষ্টা করিয়াছি। এই সাজাইবার পদ্ধতিও যে সম্পূর্ণ নির্দোষ হইয়াছে একথা সাহস করিয়া বলিতে পারি না।

উদাহরণস্বরূপ যে সকল শব্দ উদ্ধৃত করিয়াছি সেগুলি যথাস্থানে বসাইবারই চেষ্টা করিয়াছি। তবে তাহাদের অনেকগুলি স্থানান্তরেও বসানো চলে, কারণ একই শব্দের অর্থপরিবর্তনে অনেক সময়েই একাধিক কারণ বর্তমান থাকে।

২৯. সংস্কৃত স—ফারসী হ।

চলিত বাঙ্গালা ও তাহার বানান

সংস্কৃতের সঙ্গে তুলনা করিতে গিয়া পণ্ডিতেরা বরাবরই প্রাকৃতের উপমা
েন গ্রাম্য বালিকার সঙ্গে। নগরের সাজ-সজ্জা প্রসাধন অলংকরণ তাহার
ত—হয়তো বা অবজ্ঞাতও বটে। প্রকৃতির ক্রোড়ে লালিত সে, বন্ধন-
াসন মানিতে চাহে না। তাহার প্রসাধন ভিন্ন ধরণের, বেশবাস ইচ্ছাধীন;
াহার আচার বাঁধারীতির বশ নহে। আর সংস্কৃত জনপদপালিতা নাগরী;
াভিজাত্যের চিহ্ন তাহার সর্বাঙ্গ ঘিরিয়া আছে। তাহাকে নিয়ম মানিয়া
লিতে হয়। অনিয়মের উদ্দামতা তাহার মধ্যে নাই, আছে সুনিয়ত পরিমাণ-
াধ। প্রাকৃত লঘুগতি মুক্তবেণী, বন্য হরিণীর মত স্বাধীন তাহার সঞ্চরণ।

এখন এই উক্তির মধ্যে সত্যাসত্য কতটুকু আছে দেখা যাউক। প্রাকৃতের
কানো নিয়ম নাই ইহাই যদি এই উপমার অর্থ হয়—তাহা হইলে তাহা
াদৌ নির্ভুল হইবে না। চলিত ভাষা একাধিক এবং প্রত্যেকেরই ব্যবহারে
ভিন্নতা আছে। প্রতি চলিত ভাষারই একটা পৃথক নিয়ম আছে। অবশ্য সে
নিয়মের শৈথিল্য থাকা অসম্ভব নহে। প্রাকৃতমাত্রেরই ঐরূপ এক একটা
নিয়ম আছে। তথাপি তাহার যে একটা স্বাধীনতা আছে সেটা তাহার
াচ্ছন্দ্যে। স্বেচ্ছাচারের সহিত স্বাধীনতার যোগ নাই। অরাজের অর্থ
নহে।

বাঙ্গালা ভাষার ক্ষেত্রে এখন অরাজকতা উপস্থিত। রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত
ইলে দেশ যেমন খণ্ড খণ্ড হইয়া বহু ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হইয়া পড়ে, অথচ
কানো রাজ্যেই প্রকৃত রাজা থাকে না, আমাদের ভাষার ক্ষেত্রে আজ
তেমনি দুর্যোগের আবির্ভাব। লেখকদের মধ্যে যাঁহাদের কিছু কিছু শক্তি
াছে তাঁহারা প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন ধরণে লিখিতেছেন, অল্পবল বা হীনবল
লখকেরা উঁহাদেরই মধ্যে এক-একজনকে আদর্শ ধরিতেছেন। আবার কেহ
কেহ বা বাদুড়বৃত্তি অবলম্বন করিয়া বসিতেছেন। ভিন্ন ধরণ বলিতে আমি ভঙ্গী
রিতেছি না। ভঙ্গী লেখকমাত্রের ভিন্ন হইবেই। আমি বলিতেছি শব্দ ও
াক্যগঠনের প্রাথমিক নিয়মগুলির কথা। এ প্রবন্ধে কেবল শব্দগঠন অর্থাৎ
বানানের কথাই আলোচনা করিব।

বাঙ্গালা শব্দ এখন বহুরূপী। একই শব্দের বানান নানা রকমের। চলিত ভাষায় এই অত্যাচারটা সর্বাপেক্ষা অধিক। এক বাংলা শব্দেরই চার রূপ ;—বাঙ্গ্লা, বাঙ্লা, বাঙ্গালা ও বাংলা। ঙ এবং ঙ্গ-এ হসন্ত না দিলে রূপ আরও বাড়ে। একমাত্র -'ছি'প্রত্যয়যোগে কর্ ধাতু যে কত রূপ ধারণ করে তাহা বাঙ্গালী পাঠকমাত্রেই জানেন। -ছি যুক্ত হইলে কর্ ধাতু কত রকম রূপ পাইতে পারে নিম্নে তাহার একটা তালিকা দিলাম :

১. করছি	২. কোরছি	৩. ক'রছি
৪. কর্ছি	৫. কোর্ছি	৬. ক'র্ছি
৭. কচ্ছি	৮. কোচ্ছি	৯. ক'চ্ছি
১০. কৰ্চ্ছি	১১. কোর্চ্ছি	১২. ক'র্চ্ছি

এইত গেল বারটি। আবার 'ছ'এর স্থলে 'চ' লিখিলে আরও বারটি। তাহা হইলে 'কর্' ও -'ছি' র যোগে সর্বশুদ্ধ চব্বিশটি শব্দের সৃষ্টি হইতে পারে। বস্তুতঃ চব্বিশটি না হউক, প্রদর্শিত শব্দগুলির অন্তত পনের ষোলটি ছাপার অক্ষরে দেখিয়াছি। অথচ ভাবিয়া দেখিলে বেশ বুঝা যায় যে এ চব্বিশটি শব্দের মধ্যে ২৩টি সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। এই তেইশটি শব্দ যে কত দিক দিয়া কত অসুবিধা সৃষ্টি করে, ভুক্তভোগী-মাত্রেই তাহা জানেন। লেখকের অসুবিধা, প্রতিলিপিকারের অসুবিধা, কম্পোজিটরের অসুবিধা, অসুবিধা সকলেরই। প্রথম ভাষাশিক্ষার্থীদের প্রতি যে অকারণ অত্যাচার করা হয় তাহার কথা ছাড়িয়াই দিলাম।

'doing' কথাটা লিখিতে হইলে কাহাকেও ভাবিতে হয় না, 'i' লিখিব কি 'e' লিখিব। 'i'-এর উপর বিন্দুটা দিতে ভুলিয়া গেলেও বুঝিবার পক্ষে কোনো অসুবিধা হয় না। ইংরাজী যিনি কিছুমাত্র জানেন তিনিও ইহা বুঝিয়া লইবেন। কিন্তু 'করছি'র চতুর্বিংশতি রূপের কোন্‌টি লিখিব ইহা ভাবিতে কিছু সময় দিতেই হয়। অথচ ভাবনার সমাধান হইয়া উঠে না। কলমের আগায় যাহা আসে তাহাই বসাইয়া দেওয়া হয়। বানান নির্দিষ্ট না হইলে ইহা ছাড়া আর কিই বা উপায় আছে? তাহা ছাড়া 'doing' কথাটা যতই অস্পষ্ট রকমে লিখিত হউক না কেন, কথাটা কি একবার অনুমান করিয়া লইতে পারিলে—কি প্রতিলিপিকার, কি কম্পোজিটর—বানানের জন্য কাহাকেও ভাবিতে হইবে না। তাহার কারণ 'doing'এর বানান দুই রকম হইবার

উপায় নাই। কিন্তু 'করছি'র বেলায় প্রত্যেকটি অক্ষর পড়িতে পারা চাই, তাহা না পারিলেই বিপদের সম্ভাবনা।

পৃথিবীর মধ্যে প্রধান ভাষা যতগুলি তাহাদের সব কয়টিরই বানান নির্দিষ্ট হইয়া গিয়াছে। সময় হয় নাই বলিয়া আমরা আর কতদিন বসিয়া থাকিব! যতই বিলম্ব হইবে ততই জটিলতা বাড়িবে। সুতরাং অগৌণে বানান নির্ধারণ করা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয় যে কালভেদে এবং কৃৎপ্রত্যয় যোগে একটা ধাতুই প্রায় হাজার রূপ গ্রহণ করে। নিদর্শন-স্বরূপ কর্ ধাতুর রূপ-তালিকাটি এতৎসহ সন্নিবেশিত হইল।

বাঙ্গালা বানান সম্বন্ধে ইতিপূর্বে যে আলোচনা একেবারেই হয় নাই এমন নহে। কিন্তু যাহা হইয়াছে, তাহার ফল কিছু ফলে নাই। প্রায় দশ বৎসর পূর্বে অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক প্রশান্তকুমার মহলানবিশ প্রমুখ কয়েকজন পণ্ডিতের উদ্‌যোগে একটি খসড়া বানানপদ্ধতি প্রস্তুত করা হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ সাধারণভাবে ঐ পদ্ধতিটি অনুমোদন করিয়াছিলেন। সেই সময় হইতে বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের বইগুলিতে ঐ বানান পদ্ধতিই অবলম্বন করা হইয়াছিল। পরে অবশ্য আবার কিছু কিছু পরিবর্তন করা হইয়াছে।

ঐ পদ্ধতিটির সম্বন্ধে প্রশান্তবাবু বলিয়াছেন, "কাজ চালানো যায় এমন একটা পদ্ধতি খাড়া করাই আমাদের উদ্দেশ্য। তাই নিয়ম ও সংগতির দিক থেকে একেবারে সম্পূর্ণ নিখুঁত একটি পদ্ধতি তৈরী করবার চেষ্টা আমরা করিনি। অভ্যস্ত সংস্কারে যাতে বেশী আঘাত না লাগে সে দিকে দৃষ্টি রেখে জায়গায় জায়গায় অনেক অসুবিধা সত্ত্বেও অভ্যস্ত প্রচলিত বানান গ্রহণ করতে হয়েছে।" অভ্যস্ত সংস্কারকে যতদূর সম্ভব অনাহত রাখিয়াও এই যে বানানপদ্ধতি অবলম্বন করা হইয়াছিল ইহাতে এমন কিছু ছিল না যাহা লেখকসম্প্রদায়ের ভীতি উদ্রেক করিতে পারে। নূতন অপরিচিত এবং অনভ্যস্ত বিষয়ে হাত দিতে হইলেই লোকে প্রথমতঃ ভয় পাইবে ইহা স্বাভাবিক এবং সেরূপ বিষয় গ্রহণ বা স্বীকার করিতেও কুণ্ঠা বোধ করা অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু এই পদ্ধতিতে সে রকম কিছু ছিল না।

১. প্রশান্তকুমার মহলানবীশ লিখিত 'চলতি ভাষার বানান', প্রবাসী, অগ্রহায়ণ, ১৩৩২। পরে পুস্তিকাকারে পুনর্মুদ্রিত।

ইচ্ছা করিলে সকলেই সেটা গ্রহণ করিতে পারিতেন। আর অনিচ্ছার কারণ থাকিলে তাহা আলোচিত হইতে পারিত। কিন্তু এই পদ্ধতি স্বীকৃত হয় নাই, ইহার গুণাগুণ সম্বন্ধে আলোচনাও উঠে নাই। হয়তো ব বাঙ্গালী জাতির প্রকৃতিগত শিথিলতাই এইরূপ নিস্তব্ধতা এবং নিশ্চেষ্টতার কারণ।

আজ পর্যন্ত বাঙ্গালা ভাষার লেখকগণ একই শব্দের বানান লিখেন ভিন্ন ভিন্ন ভাবে। এমন কি একই লেখকের হাতে একই শব্দের একাধিক বানানও দেখা যায়। আধুনিক বাঙ্গালা-লেখকগণের পুস্তকাদিতে ইহার দৃষ্টান্তের অভাব হইবে না। আমরা কিছুকাল ধরিয়া এইরূপ দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিতেছি। এ পর্যন্ত যত শব্দ সংগ্রহ করা হইয়াছে সে গুলিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করিয়া বানান সম্বন্ধে কোন্ কোন্ স্থানে পার্থক্য ঘটে তাহা বিশ্লেষণ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। এস্থলে সেই বিবরণটুকুই লিপিবদ্ধ করিলাম। এই সমস্যাটি বঙ্গভাষার কর্ণধারগণের নিকট উপস্থাপিত করিতে চাই। যে ভাবেই হউক একটা নিষ্পত্তি হওয়া প্রয়োজন। ভাষার ব্যাকরণ প্রণয়নের সময় আসে নাই বলিয়া যথেচ্ছাচারের প্রশ্রয় দেওয়া আর চলে না। এইবার ভাষার গতিপথ নির্দিষ্ট করা অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে যতদিন না ঠিক হয় 'করছি'র চতুর্বিংশতি রূপের মধ্যে একটিমাত্র রক্ষণীয়- অপরগুলি বর্জনীয়—ততদিন প্রত্যেকেই স্ব-স্ব প্রধান।

কথা উঠিবে চতুর্বিংশতি রূপের মধ্যে শুদ্ধ কোন্‌টি? তাহার উত্তরে বলিব, শুদ্ধি অশুদ্ধির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার করিবার সময় এ নয় হয়তো সব কয়টিই শুদ্ধ হইতে পারে। আমরা বলি পণ্ডিতগণ এই চব্বিশটি শব্দের মধ্যে ভাষায় গৃহীত হইবার পক্ষে যেটির সর্বাপেক্ষা অধিক যোগ্যতা আছে তাহাকেই গ্রহণ করিবেন। বিচারকালে লিখন- সৌকর্য, ব্যাকরণশুদ্ধি প্রভৃতি সমস্ত গুণগুলিই আলোচনার মধ্যে আসিবে বিশেষজ্ঞের হাতে সে ভার অর্পণ করিতে হইবে। এইভাবে যখন নিয়মের দ্বারা তেইশটি অনাবশ্যক শব্দকে নির্বাসন দেওয়া হইবে, তখন ভাষালক্ষ্মীও অনেকটা স্বাচ্ছন্দ্যলাভ করিবেন।

প্রশ্ন উঠিবে নিয়ম করিবে কে এবং একজন তাহা করিলে সকলে স্বীকার করিবে কেন?

সাহিত্যের সব শাখায় সকলের সমান অধিকার নাই, থাকা স্বাভাবিকও নয়। এক বিষয়ে সকলেই বিশেষজ্ঞ হইতে পারেন না। বাঙ্গালা ভাষার ভূত ভবিষ্যৎ বিচার করিতে পারিবেন, তাহার হিতাহিতের ভার লইতে পারিবেন—এ আশা আমরা প্রত্যেক বাঙ্গালা লেখকের কাছে করিতে পারি না। আর লেখক বা সাহিত্যিকমাত্রই যে এ দাবি করিবেন ইহাও মনে করি করি না। আচ্ছা মনে করা যাউক, রবীন্দ্রনাথকে পুরোবর্তী করিয়া শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত যোগেশ- চন্দ্র বিদ্যানিধি, শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু প্রমুখ পণ্ডিতগণ একটি সভায় মিলিত হইয়া সকলের বা অধিকাংশের সম্মতি লইয়া একটি ব্যাকরণের খসড়া প্রস্তুত করিলেন। এইরূপে যে নিয়ম প্রণয়ন করা হইল তাহা সাহিত্যিকবর্গ বা লেখকসমাজ মানিতে অসম্মত হইবেন এরূপ আশঙ্কা করিবার কোনো সংগত কারণ আছে কি? অবশ্য ইহাও দেখিতে হইবে যে লেখকদিগকে যেন উপেক্ষা করা না হয়। ভাষার নিয়ম গঠন সম্পর্কে তাঁহাদের মতামতও আহ্বান করিতে হইবে এবং বিচারকালে তাঁহাদের মতামতের প্রতি মনোযোগ দিতে হইবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বা বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ্ যদি এই কাজে অগ্রণী হন তাহা হইলে বাঙ্গালা ভাষার একটা মহৎ কল্যাণ সাধিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ বাঙ্গালার উন্নতিকল্পে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন এবং করিতেছেন। এ বিষয়ে তাঁহাদের মনোযোগ বিশেষভাবে আকর্ষণ করি। বিধান রচিত হইলেই হয় না, তাহার প্রয়োগ শক্তিসাপেক্ষ। বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে সেই শক্তি আছে।

বাঙ্গালার বানানপদ্ধতি সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ ইতিপূর্বে যে সকল তর্কবিতর্ক করিয়াছেন দেশের শিক্ষিত জনসাধারণের দৃষ্টি সেদিকে গুরুতররূপে আকৃষ্ট হয় নাই। বানান সম্বন্ধে কথা উঠিলেই ভাষার কথা উঠে এবং বানানসমস্যার গুরুত্ব ভাষাসমস্যার নীচে চাপা পড়িয়া যায়। কথা উঠিয়াছে, বাঙ্গালায় সাধু এবং চলিত নামে যে দুইটি লেখ্য ভাষা প্রচলিত আছে, এ দুইটিরই কার কোনো আবশ্যকতা আছে কি না? 'চলন্তিকা'-কার বলেন, একটির দ্বারাই যদি কার্যসিদ্ধি হয় তবে আর একটি শিখিবার জন্য যে শ্রম করা হইবে তাহা তো হইবে পণ্ডশ্রম। তাঁহার মতে লেখ্য ভাষা একটাই থাকা উচিত তা সাধুই হউক—আর চলিতই হউক। পরে কয়েকটি যুক্তি অবলম্বন করিয়া

দেখাইয়াছেন "লেখ্য চলিত ভাষাই একমাত্র লৈখিক হবার যোগ্য, যদি তাতে নিয়মের বন্ধন পড়ে এবং সাধু ভাষার সঙ্গে রফা করা হয়।"

চলিত ভাষার পক্ষ সমর্থন করিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ বলেন—"আমাদের প্রাকৃত বাংলার যে মূল্য—সে সজীব প্রাণের মূল্য, তার মর্মগত তত্ত্বগুলি বাঁধা নিয়ম আকারে ভালো করে আজও ধরা দেয় নি বলেই তাকে দুয়ো রানীর মতো প্রাসাদ ছেড়ে গোয়াল ঘরে পাঠাতে হবে, আর তার ছেলেগুলোকে পুঁতে ফেলতে হবে মাটির তলায়, এমন দণ্ড প্রবর্তন করার শক্তি কারও নেই। অবশ্য যথেচ্ছাচার না ঘটে, সেটা চিন্তা করবার সময় এসেছে স্বীকার করি। চলিত ভাষার প্রতিই কবির আন্তরিক টান, তাহা শুধু এই উক্তি হইতেই বুঝা যায় এমন নহে, তাহার অন্যান্য নিদর্শনও আছে। কয়েক বৎসরের মধ্যে তিনি সাধুভাষা একরূপ লিখেন নাই। ললিত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার 'সাধুভাষা বনাম চলিত ভাষা' শীর্ষক পুস্তিকায় সাধু ও চলিত ভাষার মধ্যে মীমাংসা করিতে গিয়া শেষ পর্যন্ত "আধা ডিগ্রী এবং আধা ডিসমিস্" দিয়া বঙ্কিমচন্দ্রকেই আদর্শ ধরিয়াছেন। তিনি বলেন, "বঙ্কিমচন্দ্র সাধুভাষা এবং চলিত ভাষার সংমিশ্রণে যে অপূর্ব রচনারীতি প্রবর্তন করিয়া গিয়াছেন তাহাই প্রকৃষ্ট প্রণালী।" কিন্তু বঙ্কিমের ভাষাকে আমরা সাধুভাষার পর্যায়েই ফেলিয়া থাকি। সে যাহাই হউক, এ প্রসঙ্গ এখানেই বন্ধ করা ভাল। কারণ এইরূপ বাদানুবাদের মধ্যে বানানসমস্যা ভাষাসমস্যার অন্তরালে আচ্ছন্ন হইয়া যায়। এখন কিন্তু আর আমাদের কালক্ষেপ করিবার অবসর নাই। যে সমস্যাই হাতে আসে অবিলম্বে তাহারই মীমাংসা করিয়া ফেলা প্রয়োজন। চলিত বাঙ্গালার বানান সম্বন্ধে যখন বিচার করিতে বসিব তখন অন্য কোনো দিকে মন দিবার আবশ্যকতা নাই। চলিত ভাষাই একমাত্র লেখ্য ভাষা হউক বা না হউক, তাহার বানান নির্ধারণ করিবার প্রয়োজনের হ্রাস হয় না।

১. অ—ও

(ক) বাঙ্গালা শব্দের শেষ অক্ষরে যদি অ স্বর থাকে এবং সেই অ যদি প্রস্ত না হয়, তাহার উচ্চারণ হয় কতকটা 'ও'-এর মত। যেমন, মত—মতো, গত—গতো, ভাল—ভালো, গেল—গেলো ইত্যাদি এ নিয়মের বিপর্যয় কখনো ঘটে না। সুতরাং এরূপ স্থলে ও-কার যোগ

করিবার প্রয়োজন কি? যদি উচ্চারণের অনুরূপ বানান করিতে হয় তাহা হইলে তো 'বন' (অরণ্যার্থক) কে 'বোন' লিখিতে হয়, কিন্তু তাহা কি সংগত হইবে? 'গোলক' এবং 'গো-লোক' এই দুই শব্দের উচ্চারণ প্রায় সমান, কিন্তু তাই বলিয়া গোলক শব্দের 'ল'য়ে ও-কার দেওয়া কেহ সমর্থন করিবেন কি? অবশ্য অনেকে বলিতে পারেন, তৎসম শব্দের বানান পরিবর্তন অনাবশ্যক। কিন্তু শিক্ষিত ভদ্রলোকের লেখায় তৎসম শব্দের সংখ্যা কি কম? তাহার উচ্চারণে যদি অসুবিধা না ঘটে, তাহা হইলে 'ভাল' 'মত' প্রভৃতির স্কন্ধে অকারণ বোঝা চাপানো কেন?

'এমনতর' এবং 'অধিকতর' উভয় শব্দেরই 'র'-এর উচ্চারণ হয় 'রো'য়ের মত। ইহাদের কোনোটির শেষে ও দেওয়া বিধেয় কি না? সংস্কৃত অর্থাৎ তৎসম শব্দ অবিকৃত থাকিবে এইরূপ নিয়মই যদি স্থির হয়, তাহা হইলে অধিকতর'তে 'ও' যোগ করা চলে না। কিন্তু 'এমনতর'কে 'এমনতরো' লিখিলে বোধ হয় ক্ষতি হয় না। ইহাতে কোন্‌টি ফারসী 'তরহ্' আর কোন্‌টি সংস্কৃত 'তর' তাহা সহজেই চেনা যায়। রবীন্দ্রনাথের লেখায় 'এমনতরো' বানান সর্বদাই দেখা যায়।

প্রেরণার্থক ধাতুর সামান্যরূপে (infinitive) বাঙ্গালায় 'ন' লাগানো হইয়া থাকে। যথা, 'খাওয়ান' 'বসান' 'শোওয়ান' ইত্যাদি। অনেকে এই ন'কে 'নো' করেন। ক্রিয়াপদের অতীতকালের রূপেও এই সমস্যা। গেল, —গেলো? গিয়েছিল, না—গিয়েছিলো? যেত, না—যেতো? অনুজ্ঞাতেও তাই। কর, না—করো? ক'র, না—ক'রো (করিও)? এস, না—এসো? বল, না—বলো?

(খ) পরে ই বা ঈ স্বর থাকিলে পূর্ববর্তী অকারের উচ্চারণ হয় ওকারের মত। তথাপি কেহ কেহ লিখেন 'রোইল'। ই স্বর লোপ পাইলেও পূর্ববর্তী 'অ' 'ও' হয়। যেমন, কেমন 'করে' এলে? কিন্তু—সে এখন কি 'করে'? নামের গুণে 'তরে' গেল। কিন্তু—কার 'তরে' তুই কাঁদিস্? এই সকল শব্দ লিখিতে রবীন্দ্রনাথ প্রায়ই ইলেক্ বা ওকারের সাহায্য গ্রহণ করেন না। সত্যই ঐ সব শব্দে ওকারের চিহ্ন কিছু না থাকিলেও ওকারের অস্তিত্ব বুঝিবার পক্ষে কোনো অসুবিধা হয় না। বাক্যের অন্বয় দ্বারা সহজেই বুঝা যাইবে শব্দটি 'করে' (করিয়া) না 'করে' (করিয়া থাকে),

'মরে' (মরিয়া) না 'মরে' (প্রাণত্যাগ করে)। অনুজ্ঞাতে একটু অসুবিধা হইতে পারে। 'কর' (এখনই কর) এবং 'কর' (করিও) এই দুই রকম রূপের মধ্যে যে পার্থক্য সেটা সহসা ধরা না পড়িতে পারে। কিন্তু অভ্যাসের দ্বারা এ সকলও সহিয়া যাইবে বলিয়া মনে হয়। ইংরাজীর একই বানানের শব্দে স্থল বিশেষে বিভিন্ন উচ্চারণের অভাব নাই, অথচ আমরাই মাতৃস্তন্যের সঙ্গে সঙ্গে তাহা মুখস্থ করিয়া ফেলি। 'read' 'wind' প্রভৃতি শব্দ এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

একটা কথা এখানেই বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, উচ্চারণ অনুসারে বানান-পদ্ধতি স্থির করিতে গেলে তাহা বাঙ্গালা ভাষায় একটা প্রলয় আনয়ন করিবে। ধরা গেল এক স্থানের ভাষাকেই আদর্শ ধরিলাম—যদিও তাহাতেও অনেক বিপদের আশঙ্কা আছে—কিন্তু এক প্রদেশেই কোনো 'অ' 'ও'-রূপে উচ্চারিত হয়, আবার কোনো 'অ' অবিকৃত থাকে। পণ, রণ, ক্ষণ; কিন্তু মন, বন, ধন। অথচ ইহাদের প্রায় সবগুলিই সংস্কৃত শব্দ।

শুধু তাহাই নহে, ভিন্ন ভিন্ন রূপে ব্যুৎপন্ন এবং বানানেও ভেদ আছে এমন অনেক শব্দ একইরূপে উচ্চারিত হয়। বানানে ভেদ থাকিলেও উচ্চারণে কোনো অসুবিধা হয় না। এখানে বানান এক করিয়া ফেলিলে অর্থগ্রহের পক্ষেই অসুবিধা জন্মিবে। উদাহরণ স্বরূপ 'লক্ষ'—'লক্ষ্য', 'কটী'—'কোটি' প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ করা যায়।

(গ) পরে উ-স্বর থাকিলেও পূর্ববত 'অ' 'ও' হয়। যথা, 'পড়ুয়া'—'পোড়ুয়া' (পোড়ো, পড়ো, প'ড়ো); প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের লেখায় 'প'ড়ো' বানান দেখিয়াছি। ঐরূপ মরুক—ম'রুক, মোরুক; মহুয়া—মোহুয়া ইত্যাদি। উ-কার পরে আছে বলিয়া অনেকে 'গোরু'কে 'গরু' লিখেন। সুনীতি বাবু 'গোরু' লিখিবার পক্ষপাতী। তিনি বলেন মূল শব্দে ও বা উ থাকিলে অপভ্রষ্ট শব্দে তাহার চিহ্নস্বরূপ ওকার রাখা উচিত। এই কারণে তিনি 'মতি' না লিখিয়া 'মোতি' লিখেন, কারণ 'গোরু' যেমন 'গোরূপ' হইতে আগত 'মোতি' তেমনি 'মৌক্তিক' হইতে আগত।

(ঘ) পূর্বে ই বা উ স্বর থাকিলে পরবর্তী অকারাদির প্রভাবে তাহা যথাক্রমে একার বা ওকার হইতে চায়। যেমন 'ভিতর', 'ভেতর'; 'উপর', 'ওপর'; 'পিছন'—'পেছন'; 'উঠে'—'ওঠে' ইত্যাদি। 'বাংলার বানান সমস্যা'

শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে রবীন্দ্রনাথের মতটি এই প্রসঙ্গে তুলিয়া দিতেছি। "আজ-কাল অনেকেই লেখেন—'ভেতর' 'ওপর' আমি লিখি নে। কিন্তু কার বিধান মতে চলতে হবে?"

(ঙ) ঘুমান, চিবান, এগান, বিলান প্রভৃতি ণিজন্ত ধাতুর দ্বিতীয় অক্ষরের 'আ'কার উচ্চারণে 'ও' হয়। ফলে বানান হয় 'ঘুমোন' 'চিবোন' ইত্যাদি। কখনও কখনও ওকার বা আ-কার কিছুই দেওয়া হয় না, শুধু অ-যুক্ত ব্যঞ্জনটি রাখিয়া দেওয়া হয়। যেমন 'চিবতে', 'ঘুমতে' ইত্যাদি। "গাড়ী 'ঢিকতে ঢিকতে' ছুদিনের দিন পৌঁছল।"—প্রমথ চৌধুরী, নীললোহিত।

অকার বা ওকারের স্থানে উ-কারের প্রয়োগও দেখা যায়। যেমন, 'ঘুমুতে' 'চিবুতে' ইত্যাদি। তিন রকমের ব্যবহারই প্রচলিত। কি রাখিতে হইবে? আর কি ত্যাগ করিতে হইবে?

জোর দেওয়ার জন্য অনেক শব্দে একটা 'ও' যুক্ত করা হয়। যেমন, 'কখনও' 'তখনও' ইত্যাদি। কিন্তু অনেক সময় এই শব্দগুলির 'কখনো' 'তখনো' এই রকম বানান করা হইয়া থাকে। বিরুদ্ধবাদীর দল বলেন, 'কখনো' 'তখনো' 'কোনো' রাখিতে হইলে সামঞ্জস্যের অনুরোধে 'একজনো' (একজনও এ-র পরিবর্তে) রামো (রামও-এর পরিবর্তে) এইরূপ বানান সমর্থন করিতে হইবে।

২. ই—ঈ

(ক) বাঙ্গালায় 'ই' ও 'ঈ'র উচ্চারণে কোনো ভেদ নাই বলিলে অনেকে মনে করেন উভয় ই স্বরের[১] উচ্চারণ একই রকম। বস্তুতঃ তাহা নহে। 'তিন', 'রীত', 'হিম' প্রভৃতি শব্দের ই-স্বর এবং 'তিলেক', 'রিপু', 'ভীষণ' প্রভৃতি শব্দের ই-স্বর একরূপ নহে। প্রথমোক্ত উদাহরণের ই-স্বর গুরু এবং শেষোক্ত দৃষ্টান্তের ই-স্বর লঘু।[২] কিন্তু উচ্চারণ গুরু হইলে স্বর দীর্ঘ বা উচ্চারণ

১. ই-স্বর বলিলে সাধারণতঃ ই এবং ঈ এই উভয় স্বরকে ধরিতে হইবে।

২. স্বর্গীয় কবি সত্যেন্দ্র দত্তের রচিত "যক্ষের নিবেদন" শীর্ষক মন্দাক্রান্তা ছন্দে রচিত কবিতায় হ্রস্ব স্বরের গুরু উচ্চারণের অনেক উদাহরণ পাওয়া যাইবে।

লঘু হইলে স্বর হ্রস্ব হইবে এমন কোনো মানে নাই। আমরা সাধারণতঃ বানান অনুসারে উচ্চারণ বা উচ্চারণ অনুসারে বানান করি না। 'শিব' শব্দের 'ই'কে দীর্ঘ করি, 'মলিন' শব্দের 'ই'কেও দীর্ঘ করি। অথচ 'অধীনতা'র 'ঈ'র হ্রস্ব উচ্চারণ হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, বাঙ্গালার ই-স্বরের (এবং অন্য স্বরেরও) উচ্চারণ ও বানান কেহ কাহারও অধীন নহে।

কেহ কেহ সমোচ্চারিত দুই শব্দের পার্থক্য বুঝাইবার জন্য ঈ ব্যবহার করেন। রবীন্দ্রনাথ অব্যয় বুঝাইতে 'কি' এবং সর্বনাম বুঝাইতে 'কী' লিখেন। 'ছায়া সীতা' নামক একখানি উপন্যাসে 'দুক্‌খীত' বানানও দেখিতে হইয়াছে। এস্থলে অবশ্য কোনো কারণ আছে বলিয়া মনে হয় না।

(খ) মামী, মাসী, পিসী প্রভৃতি স্ত্রীলিঙ্গ শব্দে 'ই' এবং 'ঈ' এই উভয় স্বরের ব্যবহার লক্ষিত হয়। কিন্তু 'ঈ'-র ব্যবহার বেশী। 'ঈ' যদি সর্বজন-গ্রাহ্য হয়, তাহা হইলে 'দিদি'র কি বানান হইবে? বিবিকে কেহ কি 'বিবী' লিখিবেন?

(গ) পাখী—পাখি দুই বানানই দেখা যায়। দীর্ঘ ঈ বোধ হয় পক্ষীর নজিরে। বেশী—বেশি, দেরী—দেরি, খুশী—খুশি, তৈরী—তৈরি প্রভৃতিতেও দুই 'ই'। '-টি' প্রত্যয়েও দুই ইকারের ব্যবহার। যেমন 'একটি'—'একটী' কোন্-টি থাকিবে?

(ঘ) ইন্-ভাগান্ত সংস্কৃত শব্দ বাঙ্গালায় দীর্ঘ ঈকারান্ত হয়। যেমন, পক্ষী, অধিকারী, দুঃখী, সুখী ইত্যাদি। অন্য শব্দের সঙ্গে যখন এই সকল শব্দের সমাস হয় তখন দীর্ঘ ঈ কোথাও কোথাও অপরিবর্তিত থাকে। যাঁহারা হ্রস্ব করেন তাঁহারা সংস্কৃতের নিয়ম্ মানিয়া চলেন। আর যাঁহারা 'যাত্রীদল' লিখিতে চান, তাঁহারা 'যাত্রী'কে বাঙ্গালা শব্দ ধরিয়া বাঙ্গালা ব্যাকরণের নিয়মে কাজ করেন। উভয়ের পক্ষেই যুক্তি আছে। এখন কর্তব্য কি?

(ঙ) বিদেশী শব্দে ই ধ্বনি থাকিলে বাঙ্গালায় তাহা উচ্চারণ নির্বিশেষে কখনো 'ই' কখনো 'ঈ' আবার কখনো বা উভয় স্বরের দ্বারাই বানান করা হইয়া থাকে। যথা, গরিব—গরীব, খ্রিষ্ট—খ্রীষ্ট ষ্টিমার—ষ্টীমার, ষ্টিল—ষ্টীল। বিদেশী শব্দের বেলায় কেবল একটি মাত্র ই রাখাই সংগত নয় কি?

(চ) পক্ষী, দুঃখী প্রভৃতির দেখাদেখি 'দরদী' 'মরমী' প্রভৃতি শব্দেও 'ঈ'র ব্যবহার লক্ষ্য করিবার বিষয়। কিন্তু হ্রস্ব ই ও মধ্যে মধ্যে দেখা যায় না এমন নহে। জাতীয় বা দেশীয় বুঝাইতেও উভয় স্বরের ব্যবহার দেখা যায়। যথা, হিন্দুস্থানী—নি, ইংরাজী—জি, ফরাসী—সি, বাঙ্গালী—লি ইত্যাদি।

৩. উ — ঊ

উকারের গোলমাল তত বেশী নয়। 'দুক্খীতভাবে' লিখেন যে গ্রন্থকার তাঁহার বইখানি ঘাঁটিয়াও কেবল তৎসম শব্দ ব্যতীত অন্যত্র 'ঊ' চোখে পড়িল না। পক্ষীর নজিরে যাঁহারা 'পাখী' লিখেন তাঁহারাও সূত্রের নজিরে কদাচিৎ 'সূতা' লিখেন। আর 'মুহূর্ত' 'কৌতুক' 'কৌতূহল' 'শ্বশ্রূ' প্রভৃতি শব্দে 'উ' 'ঊ'র যে সকল পরিবর্তন ঘটে সেগুলি কেহ স্বেচ্ছায় করেন না বলিয়াই মনে হয়; অর্থাৎ সেগুলি সাধারণ প্রমাদের পর্যায়ে পড়ে।

৪. ঋ — ঌ

(ক) ঋ তৎসম শব্দে আছে থাকুক, তদ্ভব শব্দে যদি থাকা সম্ভব হয় তাহাতেও আপত্তি নাই। সম্ভব হয় এজন্য বলিলাম যে সংস্কৃতের 'ঋ' তদ্ভব শব্দে প্রায় অন্য স্বর হইয়া যায়। যেমন, কৃষ্ণ—কান, ঘৃত—ঘি, অমৃত —অমিয়। কিন্তু যে শব্দ দেশজ বা বিদেশী সে সকল শব্দে 'ঋ' রাখার প্রয়োজন কি? 'খৃষ্ট' 'খ্রিষ্ট' ও 'খ্রীষ্ট' একই শব্দের যখন এই রকম তিনটি বানান, তখন 'ঋ'র ব্যবহার বাদ দিলে অন্তত একটি তো কমে। এই প্রসঙ্গে 'বৃষ্টল' 'কৃষ্ট্যাল' প্রভৃতি শব্দও তুলনীয়।

(খ) ঌ বর্ণমালায় আছে মাত্র কিন্তু ভাষায় ইহার ব্যবহার নাই। সুতরাং ইহার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

৫. এ

(ক) 'এ'র উচ্চারণ দ্বিবিধ। সাধারণ উচ্চারণ ইংরাজি bed শব্দের এ ধ্বনির অনুরূপ। এতদ্ব্যতীত ইহার একটি বক্র উচ্চারণও আছে। যেমন,

'বেচা' 'চেলা' 'হেলা' 'কেমন' ইত্যাদি। সাধারণ উচ্চারণ যথা, 'রেল' 'তেল' 'মেশা' 'কেনা' ইত্যাদি। সাধারণ উচ্চারণে কোনো গোল নাই। হাঙ্গামা ঐ বাঁকা উচ্চারণ লইয়া।

কোনো কোনো লেখক 'এ্যা' বা 'য়্যা' লিখেন। আবার কেহ কেহ বক্র 'এ' বুঝাইবার জন্য 'অ্যা' ব্যবহার প্রস্তাব করিতেছেন। রবীন্দ্রনাথ ব্যঞ্জনস্থ বক্র 'এ' বুঝাইতে [ে] এইরূপ মাত্রাযুক্ত এ চিহ্ন ব্যবহার করেন। যথা, 'কেনা' কিন্তু 'বেচা', 'খেলি' কিন্তু 'খেলা'। শুধু 'এ'র বেলায় উচ্চারণের বিভিন্নতা বুঝাইবার কোনো উপায় তাঁহার কোনো পুস্তকে দেখা যায় না। 'এমন' এবং 'এমনি' এক এ দিয়াই বানান করা হয়।

কয়েকটি আধুনিক উপন্যাস ও গল্পের বই ঘাঁটিয়া 'এ্যাক' 'এ্যাতো' 'এ্যাকলা' 'ক্যামোন' প্রভৃতি বানান পাইয়াছি। 'এ'র বাঁকা উচ্চারণ বুঝাইবার জন্য পৃথক কোনো বানানের প্রয়োজন আছে কি না? যদি থাকে কোন বানান গ্রহণীয়?

(খ) কলিকাতার অশিক্ষিত সম্প্রদায় এবং স্ত্রীলোকগণের মধ্যে কোথাও কোথাও 'আ' 'অ্যা' রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন, 'কাঁথা'—'ক্যাঁথা', 'বাঁকা'—'ব্যাঁকা'। এইরূপ আকারের অ্যা-উচ্চারণ শিক্ষিত ভদ্রলোকদের মুখেও মধ্যে মধ্যে শুনিতে পাই। তাহারই ফলে সাহিত্যেও ইহা ধীরে ধীরে স্থান পাইতেছে।

এই 'অ্যা' আবার 'ই' স্বরের পূর্বে বসিয়া 'এ' হইয়া যায়। যেমন, বাঁকা—ব্যাঁকা—বেঁকিয়ে, ঝাঁটা—ঝ্যাঁটা—ঝেঁটিয়ে। 'আ'র 'অ্যা' বা 'এ' রূপ ভাষায় স্থান পাইবে কি?

•

৬. ঐ — ওই — অই

'ঐ' ধ্বনির বানান নির্দিষ্ট হওয়া আবশ্যক। কেহ লিখেন 'ঐ', কেহ লিখেন 'ওই', আবার কেহ বা লিখেন 'অই'। তিন বানানই থাকিবে কি? কৈ—কই, বৈ—বই (ব্যতীত), দৈ—দই প্রভৃতি শব্দের কোন্ বানান চলিবে?

৭. ঔ—ওউ—অউ

'ঔ' সম্বন্ধেও একই কথা বলা চলে। 'ঔ' 'ওউ' 'অউ' এ তিনের উচ্চারণ এক। যথা, বৌ—বোউ—বউ, মৌ—মোউ—মউ ইত্যাদি।

৮. মহাপ্রাণ বর্ণ

মহাপ্রাণ বর্ণগুলির সম্বন্ধেও একটা নিয়ম করা আশু প্রয়োজন। বাঙ্গালায় মহাপ্রাণ বর্ণের মহাপ্রাণতা শব্দের আদি ব্যতীত অন্যত্র প্রায় অক্ষুণ্ণ থাকে না। সেইজন্য 'করেছে' হয় 'করেচে', 'অর্ধেক' হয় 'আদ্দেক', 'বাচ্ছা' হয় 'বাচ্চা', 'শাঁখ' হয় 'শাঁক', 'পৌছেছি' হয় 'পৌচেচি', ইত্যাদি।

ঐরূপ 'বাঁঝা' 'বাঁজা', 'সাঁঝ' 'সাঁজ', 'মাঝা' 'মাজা', 'দেখ্‌ দিখিনি' 'দেক্‌ দিকিনি', 'সিন্ধুক' 'সিন্দুক' ইত্যাদি।

৯. জ—য

কোথায় 'জ' এবং কোথায় 'য' হইবে ইহা একটি সমস্যার বিষয়। কেহ কেহ সংস্কৃত বানানের অনুসরণ করিয়া 'কায' লিখেন। আবার কেহ কেহ ভাষার রীতি অনুসরণ করিয়া প্রাকৃত 'কজ্জ'র নজিরে 'কাজ' লিখেন।

ঐরূপ 'যাঁতি', 'যাঁতা', 'যোড়া' প্রভৃতি শব্দ দুই 'জ'য়ের দ্বারাই বানান করা হয়। 'জায়গা' এবং 'যায়গা' দুইটি বানানই প্রচলিত। দেশজ বা বিদেশী শব্দে একটি মাত্র 'জ' রাখাই বিধেয় নয় কি?

১০. র—ড়

পূর্ববঙ্গীয় লেখকদের হাতে পড়িয়া 'ড়' যেখানে সেখানে 'র' হইয়া যাইতেছে। সুতরাং 'র'এর স্থানেও মধ্যে মধ্যে 'ড়' বসিতেছে। কিন্তু এগুলিকে

সম্ভবতঃ ভুলের গণ্ডীতে ফেলা যায়। পূর্ববঙ্গীয় লেখকগণ 'ঝড়'কে যতই 'ঝর' লিখুন না কেন, সাহিত্যে তাহা কোনো দিন স্বীকৃত হইবে বলিয়া আশঙ্কা করি না।

১১. ন — ণ

'ন' ও 'ণ'-এর সমস্যাও বড় জটিল হইয়া পড়িয়াছে। 'বানান' শব্দটির একাধিক বানান আছে। কেহ লিখেন 'বানান', কেহ লিখেন 'বাণান'।

এইরূপ আগুন—আগুণ, সোনা—সোণা, কান—কাণ, চুন—চু নরুন—নরুণ। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃ করি: "পণ্ডিতেরা বাংলা ভাষাকে সংস্কৃত ভাষার ছাঁচে ঢালা করলেন—সেটা হলো অত্যন্ত আড়ষ্ট। বিশুদ্ধভাবে সমস্ত তা বাঁধাবাঁধি—সেই বাঁধন তার নিজের নিয়মসংগত নয়—তার ষত্ব ণ সমস্তই সংস্কৃত ভাষার ফরমাসে। সে হঠাৎ বাবুর মত প্রাণপণে চে করে নিজেকে বনেদী বংশের বলে প্রমাণ করতে চায়। যারা এই কাজ ক তারা অনেক সময়েই প্রহসন অভিনয় করতে বাধ্য হয়। কর্ণেলে গবর্ণ পণ্ডিতি করে মূর্ধন্য ণ লাগায়, সোনা পান চুনে তো কথাই নেই।"

এখন পণ্ডিতেরা বিচার করুন—কোথায় মূর্ধন্য ণ এবং কোথায় দন্ত্য লাগানো আবশ্যক।

১২. রেফ্ [´]

সংস্কৃতে দেখি রেফ্‌যুক্ত বর্ণের বিকল্পে দ্বিত্ব হয়। সর্ব্ব—সর্ব, মর্ম্ম—ম কার্য্য—কার্য ইত্যাদি। দ্বিত্ব না করিয়া লেখার দিকেই বরং ঝোঁকটা বেশী বাঙ্গালায় কিন্তু রেফযুক্ত বর্ণের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দ্বিত্ব করা হয়। ইদানী কেহ কেহ বর্ধন, মর্ম, এইরূপ লিখিতেছেন।

দ্বিত্ব না করিলে যখন সংস্কৃতে অশুদ্ধ হয় না তখন বাঙ্গালায় তৎসম বানান করিতে বৃথা দ্বিত্ব করার আবশ্যক কি? তৎসম দূরের কথা—আ 'কল্লুর্ম' 'চর্ব্বি', 'কার্ব্বন' 'পর্দ্দা' প্রভৃতিতেও দ্বিত্ব করিয়া থাকি।

১৩. বিসর্গ [ঃ]

ক্রমশঃ অন্ততঃ বস্তুতঃ প্রভৃতি শব্দে বিসর্গকে অনেক লেখকই বিসর্জন করিতেছেন। আবার রক্ষাও করিতেছেন অনেকে। কি করা কর্তব্য?

'মনস্' 'শিরস্' প্রভৃতির স্ লোপ ঘটায় 'মন' 'শির' প্রভৃতি শব্দকে খাঁটি বাঙ্গালা বলি। তথাপি সমাসের সময় পূর্বতন সংস্কৃতরূপের শরণাপন্ন হইয়া 'শিরোমণি' লিখিতে হয়।

কেহ কেহ 'মনযোগ' 'শিরমণি' লিখিতেছেন। এইরূপ প্রয়োগকে বাঙ্গালা ব্যাকরণের নিয়মে শুদ্ধ বলিয়া ধরিব কি না?

১৪. ম — ব

'ম' চলিত বাঙ্গালায় কোনো কোনো লেখকের হাতে স্থান বিশেষে 'ব' হইয়া যায়। শুদ্ধি-অশুদ্ধির কথা বলিতেছি না। আম্রের পক্ষে 'আঁব' অথবা তাম্রের পক্ষে 'তাঁবা' হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে 'আম' ও 'আঁব' 'তামা' ও 'তাঁবা' এই দুই রকম শব্দই চলিবে? না, একটি রাখিয়া অন্যটি ত্যাগ করিতে হইবে?

এইরূপ 'নামা'র রূপান্তর 'নাবা'র প্রচলন আছে। দুইটিই কি রক্ষণীয়?

১৫. ঊর্ধ্বকমা বা ইলেক [']

সংস্কৃতে দেখি সন্ধির সূত্রে দুই শব্দের যোগ হইয়া কোনো 'অ' যদি লুপ্ত হয় তাহা হইলে লুপ্ত অকার দ্বারা তাহার সন্ধিপূর্ব অস্তিত্ব দেখান হয়। যথা মনোঽন্তর। বাঙ্গালার ইলেক অনেকটা এই ধরনের চিহ্ন। কোনো বর্ণের লোপ হইলেই ইহা সাধারণতঃ বসিয়া থাকে।

(ক) করে'—ক'রে, ধরে'—ধ'রে, পড়ে'—প'ড়ে ইত্যাদি অসমাপিকা ক্রিয়ায় ইলেকের ব্যবহার দুই স্থানে দেখা যায়। ইলেকের ব্যবহার আদৌ

থাকিবে কি না তাহা অবশ্য পূর্বেই স্থির করিয়া ফেলা প্রয়োজন। যদি ইলেকের ব্যবহার চলে তাহা হইলে কোন্ কোন্ স্থলে তাহা করা প্রয়োজন তাহাই এক্ষণে আলোচনা করা যাউক। অসমাপিকা ক্রিয়ায় ইলেকের ব্যবহার যদি রাখা হয় তাহা হইলে অন্ত্য অক্ষরে দেওয়া উচিত, অথবা উপান্ত্যে ?

(খ) দেখান, শোনান, দাঁড়ান, করান, পালান, ভাঁড়ান প্রভৃতি ধাতুর সামান্যরূপে (infinitive) ন-এর তিনরূপ দেখা যায়। কখনো ন শুধুই থাকে, কখনো 'ও' যোগ করা হয়, আবার কখনো বা ইলেক দেওয়া হয়। এস্থলে ইলেক থাকা বাঞ্ছনীয় কি না ?

(গ) অনুজ্ঞায় ইলেকের ব্যবহার হইয়া থাকে। বল' (বলহ), ব'লো (বলিও); কর', ক'রো—এ সকল স্থলে ইলেক দিতে হইলে কোন্খানে দেওয়া উচিত ?

(ঘ) আপাততঃ, অন্ততঃ, বস্তুতঃ প্রভৃতি শব্দের বিসর্গ লোপ হওয়ায় কেহ কেহ ইলেক দিয়া উহাদের স্বরান্ত বুঝাইবার চেষ্টা করেন। আদৌ তাহার প্রয়োজন আছে কি ? ত অব্যয়ে ইলেক দেওয়ার প্রয়োজন আছে কি ? ত অব্যয়ে ইলেক দিয়া অনেকে উহাদের স্বরান্ত-ভাব বুঝাইবার চেষ্টা করেন। আদৌ তাহার প্রয়োজন আছে কি ? ত তো (১ সংখ্যক জিজ্ঞাসাও এই প্রসঙ্গে আলোচ্য) এবং ত' এই তিন রূপই দেখিতে পাই।

(ঙ) তা'র (তাহার) যা'র (যাহার) কা'র (কাহার) প্রভৃতি শব্দে লুপ্ত 'হা'র স্থানে কেহ কেহ ইলেক ব্যবহার করেন। ইহা কি আবশ্যক ?

(চ) 'উপর' শব্দের 'উ' উহ্য রাখিয়া উহার স্থলে ইলেক দেওয়া হয়। রবীন্দ্রনাথ, 'পরে লিখেন।

১৬. হা ই ফে ন [-] ও ফাঁ ক

(ক) সমাস হইলে দুইটি শব্দের মধ্যে হাইফেন কখনো বসে, কখনো বসে না। যথা, হাজার-বার-শ, হাত-পা, কূল-কিনারা ইত্যাদি। ঠিক এই

ধরনের শব্দই বিনা হাইফেনেও লিখিত হয়। একই প্রবন্ধের মধ্যে সেবা-প্রতিষ্ঠান ও সেবাপ্রতিষ্ঠান দেখা যায়। \

(খ) সমাসবদ্ধ পদদ্বয়ের মধ্যে বিকল্পে ফাঁকও দৃষ্টিগোচর হয়। 'ইহা দ্বারা' 'জাহাজ কোম্পানি' 'এই জন্য' 'তা ছাড়া' 'ফল দ্বারা' ইত্যাদি।

(গ) 'এ' 'যে' প্রভৃতি সর্বনামের পরবর্তী শব্দ হাইফেন দ্বারা যুক্ত হইতে দেখা যায়। যথা, এ-কথা, যে-লোক, সে দিন, ইত্যাদি।

১৭. ং, ঙ্, ঙ্গ্ ; ঙ, ঙ্গ

(ক) অনুস্বর, ঙ্, এবং ঙ্গ্ নির্বিচারে একই স্থলে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। বাংলা—বাঙ্লা—বাঙ্গালা—বাঙলা—বাঙ্গলা, রং—রঙ্—রঙ্গ্, ঢং—ঢঙ্—ঢঙ্গ্, আংটি—আঙ্টি—আঙ্গ্টি ইত্যাদি। তবে হসন্ত উচ্চারণে ঙ্গএর ব্যবহার অপেক্ষাকৃত অল্প।

(খ) স্বরান্ত উচ্চারণে অনুস্বরের ব্যবহার হয় না, কাজেই 'ঙ' এবং 'ঙ্গ' ব্যবহৃত হয় যথা, বাঙালী—বাঙ্গালী, ব্যাঙাচি—ব্যাঙ্গাচি, ভাঙানি—ভাঙ্গানি, আঙুল—আঙ্গুল ইত্যাদি।

• • • •

প্রত্যেক প্রশ্নের সহিত উদাহরণ আরও অধিক পরিমাণে সন্নিবেশিত করা যাইতে পারিত, কিন্তু বাহুল্যবোধে করি নাই। দুই চারিটি উদাহরণই পর্যাপ্ত বলিয়া মনে করি। এই সকল শব্দও কিছু নূতন নহে। বাঙ্গালী পাঠকপাঠিকামাত্রই প্রতিদিন এই ধরনের অসংখ্য শব্দ দেখিতেছেন।

কর্‌ধাতুর রূপ

প্রথম—সামান্য | প্রথম ও মধ্যম-

করে

নিত্য — করেন

বর্ত্তমান

করছে — করছেন

ক'রছে কোরছে — ক'রছেন কোরছে

ক'র্‌ছে করছে কোর্‌ছে

২. ঘটমান — ক'চ্ছে কচ্ছে কোচ্ছে

ক'চ্ছে কচ্ছে কোচ্ছে

[ছ স্থলে চ লিখিলে আরও ১২টি রূপ হয়] মোট ২৪ — [প্রথম সামান্যের মতই মোট ২।

করুক — করুন

৩. অনুজ্ঞা — ক'রুক কোরুক — ক'রুন কোরু

হসন্ত যোগে আরও ৩।] মোট ৬ — [হসন্ত যোগে আরও ৩।

করল — করলেন

অচির

(ক) ওকার ও ইলেকযোগে ৩

(খ) র-য় হসন্ত দিলে ৩

(গ) র স্থানে রেফ্‌ দিলে ৩

(ঘ) র বা রেফ্‌ তু'লয়া ল-এর দ্বিত্ব ৩

(ঙ) ল-য় ওকার দিলে ১২

[৪। (ক) (খ) (গ) (ঘ অনুসারে ১২ ন'য় হস দিলে আরও ১২।] মোট ২৪

ভূ

করলে

উপরের মত ২৪

মোট ৪৮

সংঘটিত

করেছে — করেছেন

(ক) ইলেক এবং ও যোগে

(খ) ছ স্থলে চ দিলে

(ক) (খ) অনুসারে

মোট ৪

কর্‌ধাতুর রূপ

মধ্যম—সামান্য	মধ্যম—তুচ্ছ	উত্তম	
কর করো	করিস —স্ কোরিস, —স্	করি কোরি	৫ এর স্থলে ১০
করছ [প্রথম সামান্যের মত ২৪টি রূপ, কিন্তু শেষ অক্ষরে ও উচ্চারণ থাকায় ও যোগ হইতে পারে ; তাহা হইলে আরও ২৪টি রূপ।] মোট ৪৮	করছিস [প্রথম সামান্যের মত ২৪টি রূপ। হসন্তযোগে আরও ২৪টি।] মোট ৪৮	করছি [প্রথম সামান্যের মত।] ২৪টি রূপ।	৫ এর স্থলে ১৬৮
কর করো মোট ২	কর্ [বিনা হসন্তে আর ১।] ২		৪ এর স্থলে ১৬
করলে মোট ১২	করলি মোট ১২	করলাম ১২ করলেম ১২ করলুম ১২ ৩৬ [র'র হসন্ত দিলে আরও ৩৬।] মোট ৭২	৫ এর স্থলে ১৬৮
করেছ (ক) (খ) অনুসারে ৬ ছয়ে ওকার দিলে ৬ ১২	করেছিস (ক) (খ) অনুসারে ৬ স'য় হসন্ত যোগে ৬ ১২	করেছি (ক) (খ) অনুসারে ৬	৫এর স্থলে ৩২

কর্‌ধাতুর রূপ

	প্রথম—সামান্য		প্রথম ও মধ্যম—তুচ্ছ	
৬. নিত্য	করত		করতেন	
(ক)	ইলেক এবং ও যোগে	৩	(ক) (খ) (গ) (ঘ)	
(খ)	র'র হসন্ত দিলে	৩	অনুসারে	১২
(গ)	র স্থানে রেফ দিলে	৩		
(ঘ)	র এর স্থানে ত দিলে	২		
(ঙ)	ত'য় ওকার দিলে	১২		
		১৪		
৭. ঘটমান	করছিল		করছিলেন	
	পূর্বোক্ত নিয়ম সকল অনুসারে		মোট	
৮. পুরাঘটিত	করেছিল		করেছিলেন	
		মোট ১২	মোট	৬
৯. নিত্য	করবে		করবেন	
		মোট ৬	মোট	৬
১০. অনুজ্ঞা	করবে		করবেন	
		মোট ৬	মোট	৬

কৃৎপ্রত্যয় যোগে কর্‌ ধাতু

(১) -তে	(২) -এ
করতে	করে
মোট ১২	মোট ৬

কর্‌ধাতুর রূপ

মধ্যম—সামান্য	মধ্যম—তুচ্ছ	উত্তম	
করতে	করতিস	করতাম	
(ক) (খ) (গ) (ঘ)	(ক) (খ) (গ) (ঘ)	(ক) (খ) (গ) (ঘ)	
অনুসারে ১২	অনুসারে ১২	অনুসারে ১২	
	স'য় হসন্ত দিলে ১২	করতেম ১২	৫ এর স্থলে ১০৮
		করতুম	
করছিলে	করছিলি	করছিলাম	
মোট ২৪	মোট ২৪	২৪	৫ এর স্থলে ১১২
		করছিলেম ২৪	
		করছিলুম ২৪	
করেছিলে	করেছিলি	করেছিলাম	
মোট ২৪	মোট ৬		৫ এর স্থলে ৪৮
		করেছিলেম	
		করেছিলুম ৬	
		১৮	
করবে	করবি	করব	
মোট ৬	মোট ৬	মোট ১২	৪ এর স্থলে ৩৬
করো	করিস		
মোট ৩	মোট ৬		৪ এর স্থলে ২১
			মোট ৪৮ এর স্থলে ৮২৯

কৃৎপ্রত্যয় যোগে কর্‌ ধাতু

(৩) -লে	(৪) -বার	(৫) -আ	৫ এর স্থলে ৩৩
করলে	করবার	করা	সর্বসাকল্যে
মোট ১২	মোট ২	মোট ১	৫৩ স্থলে ৮৬২

বাঙ্গালার বর্ণ ও ধ্বনি

এগারটি স্বর এবং ছত্রিশটি ব্যঞ্জন বর্ণ লইয়া বাঙ্গালা বর্ণমালা গঠিত। স্বর এগারটি হইতেছে:

অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ এ ঐ ও ঔ।

স্বরবর্ণের দলে ৠ এবং ঌ-কে স্থান দিলে স্বরের সংখ্যা আবার একাদশের স্থানে ত্রয়োদশ হইয়া যায়। বর্ণমালায় ৠ এবং ঌ থাকিবে কি না এ-প্রশ্ন সহজেই উঠিতে পারে।

বাঙ্গালা ভাষায় ঌ-র ব্যবহার একেবারেই নাই, দীর্ঘ ৠ-র প্রয়োগও নাই বলিলেই চলে। বাঙ্গালা তো দূরের কথা সংস্কৃতেই বা ঌ ও দীর্ঘ ৠকার যুক্ত শব্দ কয়টি আছে?

স্মার্তগণ ত্রিবিধ ঋণের উল্লেখ করিয়াছেন। বৈয়াকরণগণ সব ঋণ শোধ করিয়াছেন, কিন্তু 'পিতৄণ' হইতে আজিও মুক্তিলাভ করিতে পারেন নাই। 'পিতৄণ' গেলে সহর্ণের্দীর্ঘঃ সূত্রের একটি উদাহরণ কম পড়িয়া যায়। পাণিনি হইতে লোহারাম পর্যন্ত সকলকেই ঐ উদাহরণটির উপরে ভর করিতে হইয়াছে। সুনীতিবাবুর মত ভাষাতাত্ত্বিকও উপায়ান্তর পান নাই। চলন্তিক-কার রাজশেখরবাবুও চলন্তিকার পরিশিষ্ট অংশে সন্ধি পরিচ্ছেদে ঐ উদাহরণ দিতে বাধ্য হইয়াছেন। দুই-একজন সাহসিক বৈয়াকরণ 'ভ্রাতৄদ্ধি' পর্যন্ত গিয়াছেন। তবে অধিকাংশ বাঙ্গালাব্যাকরণ-প্রণেতা অতটা পর্যন্ত ভরসা করিতে পারেন নাই।

পাণিনি বোপদেব প্রভৃতির কথা থাক, কিন্তু লোহারাম, নকুলেশ্বর প্রমুখ বাঙ্গালা ভাষার বৈয়াকরণগণ যখন 'পিতৄণ' অস্বীকার করিতে পারেন নাই, তখন বাঙ্গালায় যে দীর্ঘ ৠ আছে তাহা মানিয়া লইতেই হইবে। বস্তুতঃ তাহা আমরা মানিয়া লইয়াছিও। এবং মানিয়াছি বলিয়াই ছাপাখানায় দুইটি অকেজো টাইপ অনর্থক রাখিয়াছি। দুইটি বলিতেছি এই জন্য যে, ৠ স্বীকার করিলে [ৄ] কে অস্বীকার করিবার জো থাকে না। কথাটা বোধ হয় ঠিক হইল না। বরং বলা উচিত, [ৄ] কে মানিয়াছি বলিয়াই ৠকে মান্য করিতে হইতেছে।

দীর্ঘ ৠ মানি আর যাহাই করি, ইহা যে স্বরসন্ধির একটি বিশেষ সূত্র মুখস্থ করিবার সময় ভিন্ন আর কখনো কোনো কাজে আসে না এ-বিষয়ে

প্রত্যেকেই একমত। সমগ্র বাঙ্গালা সাহিত্যের মধ্যে কয়টা দীর্ঘ ৠ খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে? যদি না-ই পাওয়া যায়, তাহা হইলে বাঙ্গালা ভাষার বর্ণমালায় উহা রাখিবার প্রয়োজন কি?

ঌকার সহজে দণ্ডায়মান হইতে পারেন না বলিয়া বর্ণবোধক পুস্তকে তাঁহাকে ডিগবাজি খাওয়ানো হইয়াছে। বস্তুতঃ ঌ-কে বাঙ্গালা বর্ণমালায় স্থান দিবার কোনো হেতু দেখি না। দীর্ঘ ৠর পক্ষে নিম্নলিখিত যুক্তিটি দেখানো যাইতে পারে:

পিতৄণ শব্দ সংস্কৃত বটে তবু উহা যদি বাঙ্গালায় ব্যবহৃত হয় তাহা হইলে উহাকে বাঙ্গালা শব্দাবলীর মধ্যে স্থান দিতে হইবে। আর বাঙ্গালা শব্দের বানানের জন্য যে বর্ণের প্রয়োজন আছে তাহাকে বর্ণমালা হইতে বিতাড়িত করা সংগত নয়।

এই যুক্তির বিরুদ্ধে এই উত্তর দেওয়া যায়:

কতকগুলি সংস্কৃত শব্দ অবিকৃত অবস্থায় বাঙ্গালা ভাষায় ব্যবহৃত হয়। বাঙ্গালা সাধু ভাষায় এইরূপ তৎসম শব্দের প্রয়োগ সুপ্রচুর। কিন্তু যে কোনো সংস্কৃত শব্দকে যে-সে যখন-তখন বাঙ্গালা ভাষায় প্রয়োগ করিতে পারে না। শক্তিশালী লেখকগণ অবশ্য মধ্যে মধ্যে নূতন কথা অন্য ভাষা হইতে গ্রহণ করিয়া অথবা নিজেরা গঠন করিয়া ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন। সংবাদপত্র প্রভৃতির দ্বারাও সময়ে সময়ে নূতন কথা ভাষায় প্রবেশ করে। অবস্থা অনুকূল হইলে সেরূপ শব্দ ভাষায় প্রচলিত হইয়া যায়। যে শব্দ একবার চলিয়া যায় তাহাকে ভাষার অঙ্গীভূত বলিয়া স্বীকার না করিয়া উপায় থাকে না। পিতৄণ যদি বাঙ্গালায় চলিয়া যাইত, তাহা হইলে উহাকে বাঙ্গালায় ব্যবহৃত বহু তৎসম শব্দের অন্যতম বলিয়া ধরিয়া লইতাম। কিন্তু পিতৄণ সে-ভাবে চলে নাই।

যে শব্দ বাঙ্গালায় ব্যবহার করা হয় না তাহাকে বাঙ্গালা শব্দ বলিয়া ধরিয়া লইব কেন? বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ-রচয়িতারাই বা সংস্কৃত ব্যাকরণের সূত্রকে বাঙ্গালা ব্যাকরণে প্রয়োগ করিবেন কেন? তৎসম শব্দের প্রসঙ্গে সংস্কৃত নিয়ম প্রযোজ্য তাহা মানি। কিন্তু এ কথা কি ঠিক নয় যে, সংস্কৃতের প্রত্যেকটি নিয়মই বাঙ্গালার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিবার প্রয়োজন নাই? সংস্কৃতে

লুপ্ত অকার (ঽ) আছে কিন্তু বাঙ্গালায় 'ততোধিক' লিখিলে কেহ দোষ দেয় কি?

বস্তুতঃ দীর্ঘ ৠ-যুক্ত কোনো পদ ব্যাকরণ ভিন্ন অন্য কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া তো মনে পড়ে না। কোনো বাঙ্গালী পিতৄণ লিখিতে রাজী হইবেন না। লিখিতে হইলে দীর্ঘ ৠকে বিচ্ছিন্ন করিয়া পিতৃ-ঋণ বা পিতৃঋণ লিখিবেন। আর কথ্য ভাষায় কেহ পিতৄণ শব্দ উচ্চারণ করিলে স্বয়ং তারাশংকর তর্করত্নের পক্ষেও হাস্য সংবরণ করা কঠিন হইত।

আর যদি তর্কের খাতিরে বাঙ্গালায় পিতৄণ শব্দের অস্তিত্ব স্বীকারই করি, তাহা হইলেও ঐ একটি শব্দের জন্য একটি [ৄ] এবং একটি ৠ টাইপ রাখার প্রয়োজন নাই। দুইটি ঋ যদি পাশাপাশি থাকে এবং উহাদের মধ্যে যদি ফাঁক না থাকে তাহা হইলে দীর্ঘ ৠ-র চিহ্ন ব্যতীতও ঐ দুইটিকে মিলিত ভাবে একটি দীর্ঘ ৠ বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।

কিন্তু কার্যতঃ এরূপ ধরিবার কোনো কারণ নাই। পিতৃঋণ-এ সন্ধি হয় নাই। এবং সন্ধি না হইলেও সমাসের দ্বারা উহাদের যোগ হইয়াছে। আর সমাসের যোগ যে সন্ধি অপেক্ষা নিবিড়তর সে সম্বন্ধে কাহারও দ্বিমত থাকিতে পারে না। এ অবস্থায় বাঙ্গালা বর্ণমালা হইতে ৠ বর্ণকে বাদ দিলে ক্ষতি কি? যদি বাদ দেওয়া যায় তাহা হইলে স্বরের সংখ্যা এগারটিই দাঁড়ায়।

এই এগারটি স্বরের মধ্যে প্রথমে অ আ দিয়াই আলোচনা আরম্ভ করা যাক।

বাঙ্গালার বর্ণমালা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে উহার একটি বৈশিষ্ট্যের প্রতি সর্বাগ্রে দৃষ্টি পড়ে। বর্ণমালার অন্তর্ভুক্ত অনেকগুলি বর্ণের নামেই আমরা এক একটি বিশেষণ যোগ করিয়া থাকি। সংস্কৃত বর্ণমালা ব্যবহারকারী জাতিসমূহের মধ্যে বোধ হয় একমাত্র বাঙ্গালীই বর্ণপরিচয়ের জন্য শুদ্ধমাত্র বর্ণের নামের উপর নির্ভর না করিয়া এক একটি বিশেষণের আশ্রয় লয়।

বাঙ্গালী শিশু পাঠশালায় যখন পড়া আরম্ভ করে, তখন শুধু অ আ বলে না; বলে স্বরে অ, স্বরে আ। শুধু ই ঈ বলে না; বলে হ্রস্ব ই, দীর্ঘ ঈ। ঐরূপ উ ঊ না বলিয়া বলে হ্রস্ব উ, দীর্ঘ ঊ।

ইহা হইতে এই প্রমাণ হয় যে, বাঙ্গালার বর্ণমালায় যে বর্ণগুলি আছে

তাহাদের প্রত্যেকটিকে বুঝাইবার জন্য পৃথক পৃথক ধ্বনি নাই। তাই কয়েক স্থলে একই ধ্বনি দ্বারা একাধিক বর্ণ সূচিত হয়।\ কাজেই এক-একটি বিশেষণ যোগ করিয়া বর্ণসমূহের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা আবশ্যক হইয়া পড়ে। ইষু এবং ঈশ এই দুই শব্দের আদ্য স্বর এক নয় কিন্তু উহাদের উচ্চারণ দ্বারা এখানে বর্ণের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না। অতএব এস্থলে যদি বলিয়া দেওয়া না হয় যে ইষুর 'ই' হ্রস্ব এবং ঈশের 'ঈ' দীর্ঘ, তাহা হইলে বানানে ভুল হইবার সম্ভাবনা। বস্তুতঃ বর্ণের মূল ধ্বনির সহিত বঙ্গীয় ধ্বনির অনেক দিক্ দিয়াই পার্থক্য ঘটিয়াছে। সেই কারণেই বাঙ্গালীর বানানে এত অশুদ্ধি দেখা যায়। বাঙ্গালী সংস্কৃতের ধ্বনি বজায় রাখিতে পারে নাই, কিন্তু সংস্কৃতের বর্ণগুলিকে যত্নসহকারে রক্ষা করিয়াছে। আমাদের কাছে দীনেশ ও দিনেশ উভয়ে সমান। গিরীশ এবং গিরিশ—ইহাদের মধ্যে যে ভেদ আছে, তাহা আমাদের চোখেই ধরা পড়ে, কিন্তু কান এড়াইয়া যায়। একই কারণে আমরা সুতপুত্র কর্ণ লিখিয়া বসি, সূরে (সূর্য) এবং সুরে (দেবতা) গণ্ডগোল করি, মুহূর্ত লিখিতে মুহুর্ত লিখি, কৌতূহলে হ্রস্ব উ এবং কৌতুকে দীর্ঘ উ দিয়া কৌতুকের সৃষ্টি করি।

বাঙ্গালার বর্ণমালায় এগারটি স্বরবর্ণের ছয়টি বিশেষণ-যুক্ত তাহা পূর্বে দেখানো হইয়াছে। বর্ণমালার প্রথম স্বরটি হইতেই আরম্ভ করা যাউক।

পল্লীর পাঠশালার সহিত যাঁহাদের পরিচয় আছে তাঁহারা জানেন অ এই স্বরটিকে স্বরে অ নামে অভিহিত করা হয়। ইহার এইরূপ নামকরণ হইল কেন? তাহার কারণ এই যে বাংলায় অ এবং য় (য়্+অ) ইহাদের উচ্চারণ প্রায় সমান। পুরাতন বাঙ্গালা পুঁথিতে অ বা য়, আ বা য়া একই শব্দে নির্বিচারে ব্যবহৃত হইয়াছে।

নিম্নলিখিত উদাহরণগুলি শ্রীকৃষ্ণকীর্তন হইতে উদ্ধৃত করা হইল:

জাঅ, (যাও অর্থে)। মাঅ, মায় (মাতা অর্থে)। হঅ, হয় (হও অর্থে)। আর, য়ার। আন, য়ানাহী (অন্যে)।

চর্যাপদ হইতে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে:

জাঅ, জায় (যায় অর্থে)। নিঅহি, নিয়ড্ডী (নিকটে)। পলুটিয়া (পাল্টাইয়া)। রঅণ, রয়ণ (রত্ন)। বিঅপ্প, বিয়প্প (বিকল্প)। বিষয়, বিষঅ। হিঅ (হৃদয়); হিঅহি, হিয়এ (হৃদয়ে)।

পূর্বে বলিয়াছি, অ এবং য় এই দুই বর্ণের উচ্চারণ প্রায় সমান। লেখার সময় অ এবং য়-এর ব্যবহারে কোনো প্রকার নিয়মশৃঙ্খলা ছিল না। 'আর' বলিবার সময় লোকে নিশ্চয় yara উচ্চারণ করিত না, তবু 'য়ার' বানান বিরল নহে। বানান সম্বন্ধে পুরাতন বাঙ্গালায় যথেষ্ট শিথিলতা ছিল, আধুনিক বাঙ্গালাতেও যে তাহা বিশেষ কমিয়াছে তাহা মনে হয় না। পুরাতন ভাষা-মাত্রেই বানানে অল্পবিস্তর যথেচ্ছাচার দেখা যায়। ইহার খুব সংগত কারণও আছে। মানুষের মুখের ধ্বনি যত দ্রুত পরিবর্তিত হয়, হাতের কাজ তত দ্রুত বদলাইতে চায় না। বর্ণমালার প্রত্যেকটি বর্ণ এক একটি ধ্বনির চিহ্ন মাত্র। এই সমস্ত ধ্বনির অনেকগুলি বদলাইয়া যায় বা লোপ পাইয়া থাকে কিন্তু তবু তাহাদের চিহ্নগুলি যায় না। আবার যে সকল নূতন ধ্বনির উদ্ভব হয় তাহাদের পরিচয়-যোগ্য চিহ্ন তৈয়ার হয় না। বানানের শিথিলতার ইহাই সর্বপ্রধান কারণ।

এই কারণে পুরাতন ভাষার বানানের উপর নির্ভর করিয়া ধ্বনিতত্ত্ব নিরূপণ করা দুরূহ। পুরাতন বাঙ্গালায় যেমন আর স্থানে য়ার পাওয়া যায় তেমনই অক্ষ স্থানে য়ক্ষ, উত্তম স্থানে য়ুত্তম, এবার স্থানে য়েবার প্রভৃতিও দৃষ্ট হয়।

আসল কথাটি এই যে, য় বর্ণটিকে অনেক সময় স্বরবর্ণের বাহনরূপে ধরা হইত। নাগরীতে অ (অ) স্বয়ং একটি স্বরবর্ণ হইয়াও অো (ও) এবং অৌ (ঔ) স্বরের বাহনরূপে ব্যবহৃত হয়। নাগরী ও অ-য়ে ওকার, নাগরী ঔ অ-য়ে ঔকার। বাঙ্গালায় এইরূপ একটা স্বরবর্ণকে অন্য স্বরের বাহন করা হয় নাই বটে, কিন্তু য় এই ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বারা বাহকতার কাজ করাইয়া লওয়া হইয়াছে।

শুধু আ-কার, ই-কার, ঈ-কার ইত্যাদি যোগ করিলে ততটা গোলযোগ হইবার কথা ছিল না। কিন্তু অ-কার শুদ্ধ য়্-এর সহিত যুক্ত হওয়ার জন্যই সমস্যাটা জটিল হইয়াছে।

অ ব্যতীত অন্যান্য সকল স্বরেরই ব্যঞ্জনাশ্রয়ী একটা চিহ্ন আছে; নাই কেবল অ-এরই। য়ামি, য়ুত্তম, য়েবার শব্দে [া] আকার, [ু] উকার, [ে] একার থাকাতে য়-এর অস্তিত্ব একরকম উপেক্ষা করাই হইয়াছে। ঐ সকল স্থলে য়-এর কোনো কাজই নাই, উহা কেবল া, ু, ে এই স্বরচিহ্নগুলিকে বহন করিতেছে মাত্র।

কিন্তু য়ক্ষ (অক্ষ), য়খণ্ড (অখণ্ড) প্রভৃতি শব্দে য় বর্ণটাই চোখে পড়ে। বস্তুতঃ য়-এর অন্তর্গত অ বর্ণটারই যে ওখানে প্রাধান্য, এবং অ-কার ব্যতীত য্-এর যে ওখানে কিছুমাত্র স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই, তাহা আর তলাইয়া দেখা হয় না। য়-কে যে অ-এর পরিবর্তরূপে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে ইহাও তাহার অন্যতম কারণ।

শিথিলতার মাত্রা ক্রমশঃই বাড়িয়া চলিল। লেখকেরা একই শব্দে য় এবং অ যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করিতে লাগিলেন। অর্থাৎ একই ধ্বনির জন্য দুইটি পৃথক্ বর্ণ বিনা বিতর্কে ব্যবহৃত হইতে লাগিল।

ইহা হইতে একটা জিনিস স্পষ্টই বুঝা যায় যে, ঐ সময়ে—অর্থাৎ যে সময়ে য় এবং অ নির্বিচারে ব্যবহৃত হইতেছে, সেই সময়ে—য এবং অ এক অ নামেই পরিচিত হইতেছিল। সংস্কৃত পণ্ডিতগণ সংস্কৃত উচ্চারণ অনুসারে এককালে ইঅ বলিতেন বটে, কিন্তু অপভ্রংশ অবস্থার পূর্ব হইতেই যকে বর্গীয় জ-এর ন্যায় উচ্চারণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। সে-কথা পরে বলা হইবে। অপভ্রংশ অবস্থায়—যখন য যশ্রুতিরূপে ভাষার মধ্যে প্রবেশ করিল তখন—যকে একটি স্বতন্ত্রবর্ণ রূপে ভাষায় স্থান দেওয়া হইল। পূর্বে য (উচ্চারণ জ) তো ছিলই, কিন্তু ঐ অবস্থায় একই য প্রাচীন সংস্কৃত উচ্চারণ (ইঅ) লইয়া পুনঃ প্রবেশ করিল। কার্যতঃ উহারা পৃথক বর্ণ (কারণ উহাদের ধ্বনি সম্পূর্ণ পৃথক্) হইলেও আকৃতিতে কোনো প্রকার পার্থক্য ছিল না। এমন কি পুরাতন বাঙ্গালাতেও [.] বিন্দুযুক্ত 'য়' দেখা যায় না। বিন্দুর বয়স খুব বেশী নয়।

যাহাই হউক, ঐ য-শ্রুতির য এবং পূর্ববর্তী য (যাহার উচ্চারণ জ) একই সময়ে ভাষায় ব্যবহৃত হইতে থাকিল। তখন y ধ্বনিসূচক য-কে ইঅ নামে অভিহিত করা হইতে লাগিল। কিন্তু এই 'ইঅ' ধ্বনি খুব সুস্পষ্ট ছিল না। এই ইঅ-র ই অংশ ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইতে হইতে শুধু অ ধ্বনিটাই রহিয়া গেল। তখন বর্ণমালা পড়িতে গিয়া দুইটা অ কানে বাজিতে লাগিল। প্রথম—স্বরমালার অ, দ্বিতীয়—ব্যঞ্জনমালার য়। ধ্বনি প্রায় এক হওয়ায় দুইটি বর্ণের দুইটি পৃথক নাম দেওয়া আবশ্যক হইল। নাম তো একই ছিল, তাহা আর পরিবর্তন করা হইল না। শুধু বিশেষণ যোগ করিয়া উহাদের পার্থক্য বুঝানো হইল।

ব্যঞ্জনের য় (যাহা অ নামেই অভিহিত হইতেছিল)-এর নাম হইল অন্তঃস্থ অ। এবং স্বরান্তর্বর্তী অ এর নাম হইল স্বরীয় অ বা স্বরে অ।

এখন য়-এর নাম অন্তঃস্থ 'অ' না হইয়া স্বরে অ-র অনুরূপ ব্যঞ্জনের অ বা ব্যঞ্জনে অ হওয়াই তো উচিত ছিল। এ-কথা মানিতেই হইবে যে, স্বরমালার একটি বিশেষ বর্ণের ধ্বনির সহিত সাম্য থাকিবার ফলেই য়-এর নামের পার্শ্বে একটি বিশেষণ বসিয়াছে। তাহা যদি হয় তবে স্বরের সহিত পার্থক্য প্রদর্শনই তো ঐ বিশেষণ প্রয়োগের মুখ্য উদ্দেশ্য। তবে ব্যঞ্জনের অ না বলিয়া অন্তঃস্থ অ বলা হইল কেন?

ইহার উত্তরে প্রথমেই একটি কথা বলা আবশ্যক। স্বরে অ নামটা প্রথমে দেওয়া হয় নাই। অন্তঃস্থ অ এই নামটিই আগে দেওয়া হইয়াছে। স্বরে অ নাম তাহার পরে দেওয়া। কাজেই স্বরে অ-র অনুরূপ ব্যঞ্জনের অ হওয়া উচিত ছিল একথা বলা চলে না।

এই মন্তব্য যদি প্রমাণিত হয় তাহা হইলে ইহা হইতে আর একটি কথাও মানিতে হয়। স্বরমালার একটি বিশেষ বর্ণের ধ্বনির সহিত সাম্য থাকিবার ফলেই য় এর নামের পার্শ্বে অন্তঃস্থ এই বিশেষণ বসিয়াছে এবং উহার নামকরণ হইয়াছে অন্তঃস্থ অ—এই মতটি সত্য নয়। এখন সেই আলোচনা করা যাউক।

সংস্কৃতের য প্রাকৃতে জ-ধ্বনি গ্রহণ করিল। অধিকাংশ প্রাকৃতে য এর বদলে জ এর ব্যবহার হইতে লাগিল। কিন্তু মাগধী প্রাকৃতে য ব্যবহৃত হইতে থাকিল। এমন কি জ এর স্থানেও স্থলবিশেষে য বসিতে লাগিল। মাগধী প্রাকৃতের য-এর ইঅ বা অ উচ্চারণ ছিল না তাহার প্রমাণ আছে। এই ধ্বনি ছিল কতকটা শ্বাসাশ্রয়ী—অনেকটা ইংরাজী z-এর মত। সুতরাং ধ্বনি যেমনই হউক না কেন, বর্ণমালায় য বরাবরই ছিল দেখা যাইতেছে। এবং এই শ্বাসাশ্রয়ী ধ্বনি যে পরে খাটি জ ধ্বনি পাইয়াছে, এখনকার উচ্চারণ হইতে তাহা বেশ বুঝা যায়।

এদিকে শব্দান্তর্গত জ এর ব্যবহারও লোপ পাইল না। অর্থাৎ মাগধীতে য এবং জ দুই বর্ণই প্রায় একরূপ ধ্বনি লইয়া ব্যবহৃত হইতে থাকিল। প্রাচীন বাঙ্গালায় মাগধীর এই বৈশিষ্ট্য বজায় আছে। চর্যাপদে অনেক জ আছে আবার (জ-উচ্চারিত) য ও কয়েকটি আছে। যেমন:

যাই—সংস্কৃত যাতি হইতে। অর্থ যায়।

যাবহু—যাবৎ।

যোজই—যোগান দেয়।

যোইআ—যোগী।

যোগী—যোগী।

যেন—যেন।

চর্যাপদে মাত্র এই ছয়টি শব্দ য-আদি। ইহার মধ্যে আবার যোগী এবং যেন এই দুইটি শব্দ তৎসম। তাহা হইলে য-আদি শব্দের সংখ্যা মোটে পাঁচটি দাঁড়ায়। অথচ এই পাঁচটির মধ্যে আবার যাই শব্দের জাই রূপ আছে। তৎসম শব্দদুইটিরও জ-কারাদি রূপান্তর আছে। চর্যাপদে জ-আদি শব্দের সংখ্যা এক শত চৌত্রিশ। ইহার মধ্যে আবার প্রায় পঁয়ষট্টিটি শব্দের জ য হইতে আগত। যেমন: জুবই (যুবতী), যে (যৎ), জোইনি (যোগিনী), জোবন (যোবন), জাহু (যাও, সংস্কৃত—√যা হইতে), জউনা (যমুনা) ইত্যাদি।

চর্যাপদে দেখিতেছি জ উচ্চারিত 'য'এর ব্যবহার খুব কম। য-এর স্থান অধিকার করিয়াছে জ। কিন্তু জ-এর স্থানে কোথাও য বসিতেছে না।

মাগধীতে য-এর প্রতিপত্তি থাকিলেও চর্যাপদে তাহা কমিল কেন তাহা চিন্তা করিবার বিষয়।

মাগধীতে আদ্য জ স্থানে য বসিত, একথা বররুচি বলিয়াছেন। হেমচন্দ্রও ঐ ধরণের মত প্রকাশ করিয়াছেন। মার্কণ্ডেয় ঐ মত সমর্থন করিয়াছেন।[১]

এতৎ সত্ত্বেও বাঙ্গালা ভাষার—মাগধীর সহিত যাহার মাতাপুত্রী সম্বন্ধ নির্দেশ করা চলে, সেই বাঙ্গালা ভাষার—আদিতম নিদর্শনে আদ্য যএর এত দৈন্য কেন?

আসল কথা মাগধীতে যে য-এর ব্যবহার ছিল তাহার উচ্চারণে প্রাচীন সংস্কৃত ইঅ ধ্বনি ছিল না, বরং কতকটা জ-এর কাছাকাছি ধ্বনিই ছিল। এমন কি প্রাকৃতের সময়ে সংস্কৃত পাঠকালেও য উত্তর-ভারতে জ-রূপে উচ্চারিত

১. S. K. Chatterji, Origin and Development of the Bengali Language, pp. 244-248.

হইতেছিল। সুনীতিবাবু 'যাজ্ঞবল্ক্য শিক্ষা' হইতে তাহার একটি প্রমাণও উদ্ধৃত করিয়াছেন।

পাদাদৌচ পদাদৌচ সংযোগাবগ্রহেষু চ।[২]

আবার বররুচিই মাগধী সম্পর্কে বলিয়াছেন,—'চ বর্গস্য স্পষ্টতা তথোচ্চারণঃ।' এই সকল প্রমাণ হইতেই প্রাচীন বাঙ্গালায় আদ্য য-এর দৈত্যের কারণ নির্ণয় করা সহজ হইবে।

মাগধীতে আদ্য জ-এর উচ্চারণে যে বিশিষ্টতা ছিল তাহাকেই স্বতন্ত্রভাবে দেখাইবার জন্য বৈয়াকরণগণ 'য' বর্ণ প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। য-বর্ণ যে সেই বিশিষ্ট ধ্বনির উপযুক্ত পরিচায়ক তাহা বলা যায় না। আসলে ঐ 'য'টা তখন প্রাকৃত ভাষার বর্ণমালায় অকেজো হইয়া বসিয়া ছিল, তাই উহার ঘাড়ে ঐ ধ্বনির ভারটা চাপাইয়া দেওয়া হইল মাত্র। কিন্তু আদ্য জ-এর (যাহার স্থানে য বসান হইল) ধ্বনির সহিত স্বরান্তবর্তী জ-এর ধ্বনির যে পার্থক্য ছিল সে পার্থক্য ধীরে ধীরে লোপ পাইল। উচ্চারণ যতই সমান হইতে লাগিল ততই আদ্য য-এর স্থানে আবার জ বসিতে লাগিল। কিন্তু য-এর ব্যবহার সম্পূর্ণ লুপ্ত হইল না।

এদিকে তৎসম শব্দে য-এর ব্যবহার তো ছিলই। সংস্কৃতের য-যুক্ত শব্দ প্রাকৃতে প্রবেশ কালে য লইয়াই প্রবেশ করিত। পরে সহজ ভাবেই এক দিন তাহা জ-এ পরিণত হইয়া যাইত।

মোট কথা এই যে, প্রাকৃতে এক জ ধ্বনি বুঝাইতে জ এবং য এই দুইটি বর্ণই ব্যবহৃত হইতে লাগিল। এই কথা মাগধী প্রাকৃত সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া খাটে। অবশ্য এ কথাও সত্য যে, জ ধ্বনি বুঝাইতে য-এর ব্যবহার অপভ্রংশের দিকে ক্রমশঃ কমিতে থাকে। বাঙ্গালা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শনে জ-উচ্চারিত য বর্ণের প্রয়োগের অল্পতা ঐ অবস্থারই পরিণতি সূচনা করে।

যখন উচ্চারণে ঐক্য থাকা সত্ত্বেও দুইটি বর্ণের ব্যবহার প্রচলিত হইল তখন দুইটি বর্ণের দুইটি নাম দেওয়া আবশ্যক হইল।

বর্গান্তর্গত বলিয়া জ এর নাম হইল বর্গীয় জ। সংস্কৃতে য-এর স্থান স্পর্শ ও উষ্ম বর্ণের অন্তঃস্থ বলিয়া উহাকে অন্তঃস্থ য বলিয়া নাম দেওয়া

২. S. K. Chatterji, Origin and Development of the Bengali Language, p. 477.

হইল, অবশ্য মুখে বলিবার সময় উচ্চারণ করা হইল অন্তঃস্থ জ। বস্তুতঃ য কে অন্তঃস্থ য বলা হইলেও উচ্চারণে অন্তঃস্থতার কোনো চিহ্নই বিদ্যমান রহিল না।

একই উচ্চারণ লইয়া দুইটি বর্ণের ব্যবহার চলে প্রাকৃত যুগ হইতে। কিন্তু ইহাদের গায়ে বর্গীয় এবং অন্তঃস্থ এই বিশেষণদ্বয়ের যোগ ঠিক কবে হইতে আরম্ভ হইল তাহা নির্ণয় করা কঠিন।

এদিকে আর এক বিপদ হইল। প্রাকৃতে স্পর্শবর্ণের লোপাধিক্যের ফলে অনেক স্বরবর্ণ পাশাপাশি বসিয়া উচ্চারণে অসুবিধা ঘটাইতে লাগিল। এই অসুবিধা যখন অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিল তখন য-শ্রুতি ও ব-শ্রুতি রূপে য ও ব (অন্তঃস্থ) ভাষায় পুনঃপ্রবিষ্ট হইল। অন্তঃস্থ ব-এর কথা পরে বলা যাইবে। এখন অন্তঃস্থ য-ই আমাদের আলোচনার বিষয়।

অন্তঃস্থ য যখন উচ্চারণে y রূপে শ্রুত হইতে আরম্ভ হয় ঐ উচ্চারণ বুঝাইবার জন্য লিখিত হয় তাহার অনেক পরে। কথার ভাষায় নূতন ধ্বনি যত সহজে প্রবেশ করে লেখার ভাষায় তাহার চিহ্ন তত সহজে প্রবেশ করিতে পারে না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, বাঙ্গালায় স্টেশন, স্টীমার প্রভৃতি শব্দের বয়স অন্ততঃ এক শতাব্দী হইবে। কিন্তু উহাদের আসল ধ্বনি প্রকাশ করিবার জন্য নূতন চিহ্নের ব্যবহার সবে আরম্ভ হইয়াছে। তাহাও এখনও সকলে গ্রহণ করেন নাই। আমরা এতদিন ষ্টিমার লিখিয়াও দিব্য স্টীমার উচ্চারণ করিয়া আসিয়াছি।

আধুনিক আর্য ভাষাসমূহ স্বতন্ত্র ভাষারূপে যখন দেখা দেয় তখন য-শ্রুতির ব্যবহার শুরু হইয়া গিয়াছে। কিন্তু প্রাকৃতে সাধারণতঃ য-শ্রুতি দেখা যায় না। প্রাকৃতের পর এবং আধুনিক ভাষাসমূহের জন্মলাভের পূর্বে কোনো সময় লেখায় য-শ্রুতির ব্যবহার আরম্ভ হইয়া থাকিবে।

ওদিকে য ধ্বনি লইয়া এক অন্তঃস্থ য তো পূর্ব হইতেই বর্ণমালায় ছিল। এখন য-শ্রুতির য (যাহার উচ্চারণ y এর অনুরূপ) আসায় একই বর্ণের দুই উচ্চারণ দাঁড়াইল। অর্থাৎ একই য এর ধ্বনি হইল (১) j এবং (২) y। বর্গীয় জ-এর সহিত বিভেদ বুঝাইবার জন্য য এর এক নাম তো ছিল অন্তঃস্থ জ। আবার অন্তঃস্থ য়-র সহিত পার্থক্য দেখাইবার জন্য উহার আর এক নাম হইল অন্তঃস্থ অ (ইঅ)। অন্তঃস্থ অ (য়) এবং অন্তঃস্থ জ (য) —

বর্ণমালায় ইহারা অভিন্ন। তাই উহাদের নামবিশেষণেও অভিন্নতা রাখা হইয়াছে। ঐ অন্তঃস্থ বিশেষণ যুক্ত জ এবং অ অধুনা-প্রচলিত দুইটি ধ্বনির পরিচয় দিতেছে।

এই কারণেই স্বরমালার প্রথম বর্ণের নাম স্বরে অ হইলেও ব্যঞ্জনমালার এই বর্ণটির নাম ব্যঞ্জনের অ না হইয়া অন্তঃস্থ অ হইয়াছে।

মোট কথা তাহা হইলে এই দাঁড়াইতেছে। মাগধী প্রাকৃতে য এবং জ এই দুইটি বর্ণেরই প্রচলন ছিল। কিন্তু রূপের পার্থক্য থাকিলেও ইহাদের ধ্বনিগত সাম্য ছিল। মাগধীর এই বৈশিষ্ট্য বাঙ্গালাতেও বর্তাইয়াছে। প্রাকৃত অবস্থা হইতে খাঁটি বাঙ্গালায় আসিতে আসিতে এই দুই বর্ণের ধ্বনিতে আর কিছুমাত্র পার্থক্য রহিল না। যখন উচ্চারণে পার্থক্য রহিল না তখনই উভয়ের নামে বিশেষণ যোগ করিয়া উহাদের চিহ্নিত করা আবশ্যক হইল। অপভ্রংশের শেষ অবস্থা হইতে বাঙ্গালার সূচনাকালের মধ্যে কোনো এক সময় এই দুই বর্ণ এইভাবে বিশেষিত হইয়াছিল বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।

জ যখন বর্গীয় জ এবং য যখন অন্তঃস্থ জ নামে পরিচিত হইয়া গিয়াছে তখন য-শ্রুতির য লেখার মধ্যে ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। য-শ্রুতির য (যাহার উচ্চারণ y) এবং পূর্ববর্তী য (যাহার উচ্চারণ j) দুইয়েরই আকৃতি একরূপ। বস্তুতঃ উহারা একই বর্ণ, কিন্তু ধ্বনি ভিন্ন। তাই নামের অনেকখানি অর্থাৎ অন্তঃস্থ এই বিশেষণ অংশ রাখিয়া কেবল ধ্বনিপরিচায়ক অংশটুকু বদলাইয়া দেওয়া হইল। একটি য এর নাম ছিল অন্তঃস্থ জ অন্য য এর নাম হইল অন্তঃস্থ ইঅ তাহা হইতে অন্তঃস্থ অ।

এদিকে একটি ব্যঞ্জনবর্ণ হঠাৎ অন্তঃস্থ অ নাম লওয়ায় স্বরের অ কে স্বরে অ নামে চিহ্নিত করিয়া ব্যঞ্জনের অ-র সহিত তাহার পার্থক্য নির্দেশ করা হইল।

আ-র নূতন নামকরণ হইল স্বরে আ। স্বরের অ-র সাদৃশ্যে স্বরে আ হওয়াই সম্ভব। পরে হ্রস্ব ই, দীর্ঘ ঈ, হ্রস্ব উ, দীর্ঘ ঊ এবং পূর্বে স্বরে-অ আছে। এ অবস্থায় আ নিঃসঙ্গ থাকিলে বর্ণমালা পাঠকালে ছন্দ বজায় থাকে না। সেটাও স্বরে-আ নামকরণের কারণ হইতে পারে।

বাঙ্গালা ভাষায় তৎসম শব্দ

তৎসম শব্দটি একটি পরিভাষিক শব্দ। ভাষাতত্ত্বের ক্ষেত্রেই ইহার ব্যবহার সীমাবদ্ধ ছিল। বর্তমানে বাঙ্গালা ভাষার সংস্কার সাধন করিয়া বাঙ্গালী বৈয়াকরণগণ খাঁটি বাঙ্গালা ব্যাকরণ রচনার দিকে মনোযোগী হওয়ায় বহু পুরাতন পরিচ্ছেদের পরিবর্তন এবং নূতন পরিচ্ছেদের সংযোজন ঘটিয়াছে। তাহার ফলে বাঙ্গালা ব্যাকরণের কলেবর অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। নবসংযোজিত পরিচ্ছেদসমূহের মধ্যে "বাঙ্গালা শব্দের শ্রেণীবিভাগ" অন্যতম। এই বিভাগে বাঙ্গালা ভাষায় ব্যবহৃত শব্দাবলীর জাতিবিচার করিয়া তাহাদিগকে কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। ইহাদেরই অন্যতম শ্রেণীর নাম তৎসম। বাঙ্গলা ব্যাকরণে এই শব্দ ব্যবহৃত এবং—বাঙ্গালা ব্যাকরণ বিশেষ পাঠ্যরূপে নির্দিষ্ট হওয়ায় বর্তমানে এই শব্দটি—শিক্ষিত সমাজে বেশ প্রচলিত হইয়াছে।

তৎসম শব্দের মানে কি জিজ্ঞাসা করিলেই সকলে বলিবেন, 'তৎ' অর্থাৎ সংস্কৃত, 'সম' অর্থাৎ সমান। যাহা সংস্কৃতের সমান তাহাই তৎসম। ব্যাখ্যা করিয়া বলা হয়, ভাষায় যে সকল সংস্কৃত শব্দ অবিকৃতভাবে ব্যবহৃত হয় তাহাই তৎসম শব্দ। তখনই প্রশ্ন জাগে 'অবিকৃত' এই কথার অর্থ কি? উত্তর পাই—কেন? যে সকল শব্দের রূপ অব্যাহত থাকে তাহাদেরই অবিকৃত বলিব। যেমন,—সূর্য, চন্দ্র, বৃক্ষ, উর্ধ্ব, তৃণ, পুষ্প ইত্যাদি।

তৎসম কথাটির যে ব্যাখ্যা উপরে দেওয়া হইল তাহা বাঙ্গালা ভাষার বৈয়াকরণদের মনগড়া ব্যাখ্যা নয়। প্রাকৃত বৈয়াকরণগণই তৎসম শব্দকে উল্লিখিত অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। প্রাকৃত ভাষায় যে সকল সংস্কৃত শব্দ সংস্কৃতরূপে ব্যবহার করা হইত, তাঁহারা সেই সকল শব্দকে তৎসম আখ্যা দিয়াছেন। প্রাকৃত ভাষার ব্যাকরণকারদের অনুসরণ করিয়া বাঙ্গালা ভাষার বৈয়াকরণগণও বাঙ্গালা ভাষায় ব্যবহৃত সংস্কৃত-আকৃতিবিশিষ্ট শব্দকে তৎসম নামে অভিহিত করিতেছেন।

প্রাকৃতের সাদৃশ্যে এই নামকরণ সংগত হইয়াছে কিনা তাহা আলোচনার বিষয়। বাহ্যতঃ এই নামকরণের সংগতি আছে বলিয়াই মনে হয়, কিন্তু সূক্ষ্মতর বিচারে সন্দেহ জাগে। প্রাকৃত বৈয়াকরণগণ 'সম' বলিয়াছেন কোন্ অর্থে?

রূপের দিক দিয়া সমান? না; ধ্বনির দিক দিয়া সমান? বাঙ্গালায় সংস্কৃতের রূপটাকেই গণনা করা হয়। প্রাকৃতে কি হইত? শুধু রূপ, অথবা শুধু ধ্বনি, অথবা রূপ এবং ধ্বনি উভয়েরই সমতা বিচার করা হইত? আমাদের মনে হয় কেবল ধ্বনিটাকেই তাঁহারা লক্ষ্য করিয়াছেন। রূপ তাঁহাদের গণনার অন্তর্ভুক্ত ছিল না। আমাদের ধারণা সত্য প্রমাণিত হইলে বলিতে হইবে বাঙ্গালা ভাষায় যে শব্দগুলির তৎসম নাম দেওয়া হইয়াছে, তাহারা আর যাহাই হউক তৎসম নয়।

প্রাকৃত ভাষায় তৎসম শব্দে যে ধ্বনিসাম্যকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে, এই উক্তির বিচার করা যাউক।

প্রাকৃত ব্যাকরণকারগণের মত এই যে প্রকৃতি শব্দ হইতে প্রাকৃত শব্দ উৎপন্ন। যাহা প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত তাহাই প্রাকৃত। তাঁহাদের মতে প্রকৃতি সংস্কৃত, অতএব সংস্কৃত হইতে যাহা উৎপন্ন তাহাই প্রাকৃত।[১]

প্রাকৃত বৈয়াকরণগণ যাহাই বলুন ভাষাতত্ত্বের পণ্ডিতগণ বলিতেছেন বৈদিকসংস্কৃত হইতে প্রাকৃতের উৎপত্তি। বৈদিক সংস্কৃত বলিতে প্রাচীন ইন্দো আর্য যুগের সমস্ত ভাষা এবং উপভাষাও বুঝিতে হইবে। তাঁহাদের মতে লৌকিক সংস্কৃত ঠিক কথার ভাষা ছিল না। বৈদিক ভাষা যখন ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত আর্যাবর্তে ছড়াইয়া পড়িল তখন স্বভাবতঃই বিভিন্ন প্রদেশে তাহার বিভিন্ন রূপ দেখা দিল। বিভিন্ন প্রাকৃতের সূচনা হয় এইভাবে। বৈদিক ভাষার এই সকল রূপকে সংস্কৃত করিয়া বৈদিক সাহিত্যের ভাষার আধারের উপর লৌকিক সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা হইল। অতএব দেখা যাইতেছে বৈদিক এবং লৌকিক সংস্কৃত পরস্পর হইতে পৃথক হইলেও উভয়ের মধ্যে মিল অনেক। সেই কারণেই সংস্কৃত শব্দটা ব্যাপক অর্থে বৈদিক এবং লৌকিক দুই ভাষার সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হইতেছে।

এখন পূর্ব প্রসঙ্গে ফিরিয়া আসা যাউক। সংস্কৃত যে ভাষার প্রকৃতি সে ভাষার ধ্বনির সহিত সংস্কৃত ধ্বনিসমূহের মিল থাকা স্বাভাবিক। বস্তুতঃ তাহা ছিলও। প্রাকৃত ব্যাকরণ নামে যে সকল প্রাচীন ব্যাকরণ আছে, অর্থাৎ সংস্কৃত পণ্ডিতেরা যে সকল প্রাকৃত ব্যাকরণ লিখিয়াছেন তাহার কোনোটিই

১. "প্রকৃতিঃ সংস্কৃতম্, তত্র ভবং তত আগতং বা প্রাকৃতম্।" —হেমচন্দ্র

মৌলিক ব্যাকরণ নয়। প্রাকৃত ভাষাকে একটি স্বতন্ত্র ভাষা বলিয়া ধরিয়া তাহার ধ্বনি বর্ণ, শব্দ, ধাতু, বাক্য, রীতি প্রভৃতি সম্বন্ধে এ সব ব্যাকরণে আলোচনা করা হয় নাই। পক্ষান্তরে কেবল সংস্কৃত ভাষার সহিত বিভিন্ন প্রাকৃতের তুলনা করা হইয়াছে। তুলনাও খুব বিস্তারিত নয়। সংস্কৃতের সহিত প্রাকৃতের যে যে স্থলে পার্থক্য কেবল সেই সেই স্থানগুলির প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বাকি সব সংস্কৃতের মত বলিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

ইহা হইতে অনুমান করা অসংগত হইবে না যে, প্রাকৃত ভাষায় যে সকল তৎসম শব্দের ব্যবহার হইত তাহারা ধ্বনি ও রূপের দিক দিয়া সংস্কৃতের সমান ছিল। কিছু ব্যতিক্রম থাকিলে তাহার কথা কোনো-না-কোনো স্থানে বলা হইত, কিন্তু তাহা হয় নাই।

ভিন্ন ভিন্ন প্রাকৃত ভাষার মধ্যেও উচ্চারণে মোটামুটি মিল ছিল। অমিলও ছিল। প্রাকৃত ভাষায় সেই অমিলগুলির উল্লেখ আছে। এই অমিলগুলি প্রাকৃত ভাষাসমূহের পারস্পরিক বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করে।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, প্রাকৃত ভাষায় একটিমাত্র অঘোষ উষ্ম বর্ণ[২] আছে। তাহা দন্ত্য স। কিন্তু একমাত্র মাগধী প্রাকৃতে ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। মাগধীতে দন্ত্য স ও মূর্ধন্য ষ নাই, আছে শুধু তালব্য শ।[৩] এরূপ অবস্থায় একই শব্দকে কোনো প্রাকৃতে তৎসম এবং কোথাও বা খাঁটি প্রাকৃত (তদ্ভব) বলা যাইতে পারে। 'কুসুম' শব্দ সংস্কৃত। প্রাকৃত ভাষার (মাগধী ব্যতীত) ধ্বনিতত্ত্ব অনুসারে কুসুম শব্দের উচ্চারণ করা কোনো দিক দিয়া কঠিন ছিল না। সুতরাং প্রাকৃত ভাষায় কুসুম শব্দে সংস্কৃত বানানই রক্ষিত আছে। উহার বানান পরিবর্তন করিবার কোনো প্রয়োজনই অনুভূত হয় নাই। সে হিসাবে কুসুম শব্দ (মাগধী ব্যতীত) সকল প্রাকৃতেই তৎসম শব্দরূপে রক্ষিত হইয়াছে।

মাগধী প্রাকৃতে দন্ত্য স বা মূর্ধন্য ষ নাই। কাজেই ঐ প্রাকৃতে কুসুম

২. বাঙ্গলা বর্ণমালায় চারিটি উষ্ম বর্ণ—শ ষ, স, হ। ইহার মধ্যে প্রথম তিনটি অঘোষ, তুর্থ টি ঘোষবৎ।

৩. ষসোঃ শঃ ॥ —বররুচি, প্রাকৃতপ্রকাশ ১১।৩

থাকিতে পারে না। সেখানে ইহার বানান হইবে কুশুম। অন্যান্য প্রাকৃতে যাহা তৎসম নামে অভিহিত তাহাই মাগধীর বেলা খাঁটি প্রাকৃতের পর্যায়ে নামিয়া আসিল। আবার মাগধীতে 'শিলা' শব্দ তৎসম হইলেও অন্যা প্রাকৃতে 'সিলা' হইয়া যাইবে। তখন উহা আর তৎসম থাকিবে না।

প্রাকৃত ভাষার ব্যাকরণ, বিশেষতঃ শব্দের বানান যে ধ্বনির উপরে প্রতিষ্ঠিত তাহা সহজেই বুঝা যাইতেছে। খাঁটি সংস্কৃত শব্দের প্রতিও কিছু মাত্র করুণা দেখানো হয় নাই; যেখানেই ধ্বনিতে পরিবর্তন আসিয়াছে সেখানেই বানান বদলাইয়াছে।

ইহা অবশ্যই স্বীকার্য যে জীবন্ত ভাষার ধ্বনি যত শীঘ্র বদলায়, বানান তত সত্বর পরিবর্তিত হয় না। প্রাকৃত গ্রন্থে—কি সাহিত্যে কি ব্যাকরণে—যে বানান দেখি তাহাও নিশ্চয় লিখিত হইবার বহু পূর্বেই উচ্চারণে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। হয়তো মাগধী যখন 'কুশুম' বলিতে আরম্ভ করে তাহার পর দুই তিন শতাব্দী পর্যন্ত 'কুসম'ই লিখিয়া আসিতেছিল। মহারাষ্ট্রী 'সিলা' উচ্চারণ করিয়াও হয়তো বহুদিন ধরিয়া 'শিলা'ই লিখিয়াছে।

তাহা ছাড়াও আর একটা কথা এই যে, সংস্কৃত বৈয়াকরণগণ যখন সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ লিখিলেন, তখন তাঁহাদের হাতের কাছে সংস্কৃত সাহিত্যের অন্ত ছিল না। ভাষার ব্যাকরণ নির্মাণের জন্য লিখিত উপকরণ প্রচুর ছিল বলিয়া তাঁহারা কর্ণ অপেক্ষা চক্ষুর সাহায্যই বেশী লইয়াছিলেন। কিন্তু প্রাকৃত বৈয়াকরণগণ (ইঁহাদের মধ্যে অনেক সংস্কৃতে ব্যাকরণ লিখিয়াছিলেন এবং সকলেই সংস্কৃত ভাষাতে পণ্ডিত ছিলেন) প্রাকৃত ভাষার ব্যাকরণ রচনা করিতে গিয়া ধ্বনির উপর জোর দিতেই বাধ্য হইয়াছিলেন।

সংস্কৃত ভাষার যে খ্যাতি প্রাকৃতের সে খ্যাতি থাকার কথা নয়। সংস্কৃত নাটকে প্রাকৃত ভাষার ব্যবহার হইতেই তাহা প্রমাণিত হয়। কাজেই প্রাকৃত ভাষায় প্রচুর সাহিত্য রচিত হইতে পারে নাই। হইলেও গ্রাম্য সমাজে যে সাহিত্য চলিত পণ্ডিত-সমাজে তাহার স্থান ছিল না। এই সকল কারণে বৈয়াকরণগণকে মৌখিক ভাষার উপরেই বেশীর ভাগ নির্ভর করিতে হইয়াছে।

উদাহরণ দ্বারা বক্তব্যটি পরিষ্কার করিবার চেষ্টা করিতেছি।

প্রাকৃত ভাষায় যে সকল বাক্যে ক্রিয়াপদের বাড়াবাড়ি নাই সেই সমস্ত

বাক্যের দিকে দৃষ্টি দিলেই দেখিতে পাইব যে, সংস্কৃতের সহিত তাহাদের পার্থক্য প্রধানতঃ ধ্বনিগত। ধ্বনিপরিবর্তনের নিয়মটি জানা থাকিলে প্রাকৃত বাক্যকে সংস্কৃতে পরিবর্তিত করা মোটেই দুরূহ নয়।

অহিণব-মহু-লোলুবো তুমং তহ
পরিচুম্বিঅ চুঅ-মঞ্জরিং।
কমলবসইমেত্ত নিব্বুত্ত মহুঅর
বিসমরিদোসিণং কহং॥

মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতে রচিত এই শ্লোকের সংস্কৃত রূপান্তর এইরূপ :

অভিনব মধুলোলুপস্ত্বং তথা
পরিচুম্ব্য চূতমঞ্জরীম্।
কমলবসতিমাত্রনির্বৃতো মধুকর
বিস্মৃতোঽসি এনাং কথম্॥

প্রাকৃত ব্যাকরণের ধাতুরূপ শব্দরূপ কৃৎতদ্ধিত কিছু না জানিয়াও শুধু ধ্বনিতত্ত্বের মূল নিয়মগুলি জানিলেই এই সংস্কৃত ভাষান্তর করা সম্ভব। বস্তুতঃ উল্লিখিত প্রাকৃত কবিতার শব্দগুলিকে শুধু ধ্বনিতত্ত্বের নিয়ম অনুসারে বদলাইয়া দেওয়াতেই উহা বিশুদ্ধ সংস্কৃত হইয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু ঐ কবিতাটি বাঙ্গালায় রূপান্তরিত করিলে কিরূপ হইবে তাহা দেখা যাক।

"অভিনব-মধু-লোলুপ মধুকর, তুমি চূতমঞ্জরীকে ঐভাবে চুম্বন করিয়া কমলবসতিমাত্র-নির্বৃত হইয়া ইহাকে কি রূপে বিস্মৃত হইলে?"

বাঙ্গলা হিসাবে ইহা অশুদ্ধ নয়। অর্থও বিকৃত হয় নাই। কেবল একটি শব্দ একটু কঠিন হইয়াছে। নির্বৃত শব্দটি 'সুখী' অর্থে বাঙ্গালায়—সচরাচর চলে না। সংস্কৃত 'অসি', 'এনাম্' এবং 'কথম্' এই তিনটি শব্দ ছাড়া অন্য কোনো শব্দের পরিবর্তন করা হয় নাই।

এই বাঙ্গালা অনুবাদটির দিকে দৃষ্টিপাত করিলে একটি জিনিস সর্বাগ্রে মনোযোগ আকর্ষণ করিবে। ইহার সহিত প্রাকৃতের মিল যতখানি সংস্কৃতের মিল তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী। আমি বাঙ্গালী। বাঙ্গলাদেশের উচ্চারণ অনুসারে এই অংশটি পাঠ করিয়া গেলে অ-বাঙ্গালীর কানে ইহার সহিত সংস্কৃতের মিল ততটা ধরা পড়িবে না। কারণ ধ্বনির দিক দিয়া

বাঙ্গালার সহিত সংস্কৃতের মিল অধিক নয়। কিন্তু বানানের দিক দিয়া এই মিল বড় বেশী। এই অংশটিতে সবশুদ্ধ ২১টি শব্দ আছে। ইহাদের মধ্যে ১৫টির রূপ সংস্কৃত। কিন্তু ধ্বনি হিসাবে বিচার করিলে একটিমাত্র সংস্কৃত পাই। তাহাও সম্পূর্ণ নির্দোষ নয়। সেটি হইতেছে কমল। অথচ গাণিতিক হিসাব দেখাইয়া পণ্ডিতেরা বাঙ্গালা সাধুভাষায় বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দের সংখ্যা নিরূপণ করিয়াছেন শতকরা ৪৪টা।[৪]

বাঙ্গালা ভাষার বহু খ্যাতনামা লেখকের লেখায় তথাকথিত বিশুদ্ধ শব্দের সংখ্যা শতকরা ৪৪ অপেক্ষাও অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু কার্যতঃ কয়টি খাঁটি সংস্কৃত তাহা বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক।

বাঙ্গালা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন হইতেছে বৌদ্ধ সিদ্ধাচর্যগণের রচিত কয়েকটি পদ। এগুলি প্রায় হাজার বছরের পুরাতন। স্বর্গীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপালে একখানি প্রাচীন পুঁথি আবিষ্কার করেন, সেই পুঁথিতেই এই পদগুলি ছিল। পদগুলির সংখ্যা ৪৭। পুঁথিখানি ১৩২৩ সালে মুদ্রিত হইয়াছে।

এই চর্যাপদগুলিই বর্তমানে বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাস নির্মাণে প্রধান ভিত্তিস্তম্ভের কাজ করিতেছে। তাহার পরই আসিয়া পড়িতে হয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে। চণ্ডীদাসের নামাঙ্কিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন নামক গ্রন্থ এই সময়কার লেখা। পণ্ডিত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় এই গ্রন্থখানির আবিষ্কর্তা ও সম্পাদক। বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাসে প্রাচীন এবং আধুনিক কালের মধ্যে এই গ্রন্থটিই একমাত্র যোগসূত্র।

চর্যাপদ এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষায় শব্দের বানানে অসংগতি আছে। একই শব্দের একাধিক বানান অনেক স্থলে দৃষ্টিগোচর হয়। বাঙ্গালা সাহিত্যে এই বানানবিভ্রাট তৎপরবর্তী যুগেও কম ছিল না। চর্যাপদ এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষায় তথাকথিত তৎসম শব্দ খুবই অল্প। সংস্কৃত শব্দের প্রতি বঙ্গভাষার আনুগত্য বঙ্গভাষার লেখকরা তখনও স্বীকার করেন নাই। সংস্কৃত শব্দই যদি লিখিতে হয়, তাহার জন্য দেশভাষার আশ্রয় লইতে হইবে কেন? সেজন্য তো দেবভাষাই আছেন।

৪. ডাঃ শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়—বাঙলা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা

প্রথম যুগে যাঁহারা দেশভাষায় লিখিতে আরম্ভ করেন তাঁহাদের অধিকাংশই ছিলেন সংস্কৃতে পণ্ডিত। সংস্কৃত ছাড়িয়া যখন দেশভাষা ধরেন তখন দেশের জনসাধারণের প্রতি ছিল তাঁহাদের দৃষ্টি, পণ্ডিতসমাজের প্রতি নহে। যে ভাষাটা সত্য সত্যই তাহাদের সেই ভাষাতেই তাঁহারা লিখিবার প্রয়োজন বোধ করিয়াছিলেন বলিয়াই লিখিয়াছিলেন।

চণ্ডীদাস যে সংস্কৃত জানিতেন, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে তাহার প্রমাণ আছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে প্রত্যেক খণ্ডের প্রথমে এবং বিভিন্ন খণ্ডের মধ্যেও কোনো কোনো পদের গোড়ায় একটি করিয়া সংস্কৃত শ্লোক আছে। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, তাঁহার বাঙ্গালা পদে বানানে যথেষ্ট গোলমাল থাকিলেও এই সংস্কৃত শ্লোকগুলিতে কোনো অসংগতি নাই।

বিদ্যাপতির নামও এই সম্পর্কে স্মরণ করা যায়। সংস্কৃত ভাষায় বিদ্যাপতির বিশেষ পাণ্ডিত্য ছিল। সংস্কৃত ভাষায় রচিত তাঁহার গ্রন্থও অনেক আছে। তবু দেশভাষা মৈথিলীতে তিনি যে পদ রচনা করিয়াছেন তাহাতে তিনি সংস্কৃতের প্রতি কিছুমাত্র আনুগত্য দেখান নাই।

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল' আর একটি দৃষ্টান্ত। কবি যে সংস্কৃতে পণ্ডিত ছিলেন তাহা তাঁহার রচনার বহুস্থল হইতে প্রমাণিত হয়, তবু তাঁহার বাঙ্গালা বানানে অধিকাংশ সংস্কৃত শব্দ বিশুদ্ধ থাকিতে পারে নাই।

বস্তুতঃ বাঙ্গালা ভাষার প্রথম যুগের ইতিহাস আলোচনা করিলে ইহা বেশ বুঝা যায় যে, যেমন রচনাপদ্ধতিতে তেমনি বানান পদ্ধতিতেও সংস্কৃতের প্রভাব অল্প ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতেই এই প্রভাব অতিশয় বৃদ্ধি পায়।

ইহার পূর্ব পর্যন্ত বাঙ্গালা বানানে কোনো নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায় না সত্য, কিন্তু বানানকে যে উচ্চারণের অনুগত করিবার চেষ্টা ছিল তাহা সহজেই বুঝা যায়। কবিকঙ্কণের চণ্ডী[৫] হইতে কয়েকটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়া দেখাই:

৫. মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণ—চণ্ডীমঙ্গল, প্রথম খণ্ড, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণ। যে পুঁথি অবলম্বন করিয়া এই সংস্করণ মুদ্রিত হইয়াছে, তাহা মুকুন্দরামের স্বহস্ত-লিখিত না হইতে পারে, তথাপি সে পুঁথিটি প্রামাণিক বলিয়া গণ্য হইয়াছে। ইহার লেখক যিনিই হউন না কেন তিনি যে কবির মূল রচনাকে স্বেচ্ছায় অথবা অজ্ঞানতাবশতঃ বিকৃত করিয়াছেন এমন মনে করিবার কোনো হেতু নাই।

চণ্ডীমঙ্গলের বানান	আধুনিক বানান	
অবশানে	অবসানে	পৃঃ ৯৬
উচ্ছর্গী	উৎসর্গ	,,
শেহ	সেই	পৃঃ ৯৭
শেবা	সেবা	,,
রুক্কিণী	রুক্মিণী	,,
শশঙ্ক	সশঙ্ক	পৃঃ ৯৯
মোহামাইয়া	মহামায়া	,,
বিশয়	বিষয়	,,
জারে জা	যারে যা	,,
শপ্তম	সপ্তম	পৃঃ ১০২
মাশে	মাসে	,,
শহিত	সহিত	পৃঃ ১০৩
শমুখে	সমুখে	,,
শদন	সদন	,,

ধ্বনিগত বানান অনেক স্থলে ছিল সত্য কিন্তু সর্বত্র ছিল না। বহু সংস্কৃত শব্দের সংস্কৃত রূপই রক্ষিত হইয়াছিল,' ধ্বনি-অনুসারে বানান বদলানো হয় নাই।

প্রথম যুগে বানানবিভ্রাটের এই যে সূত্রপাত হইল, ভাষার ক্ষেত্রে ইহাই ছিল স্বাভাবিক। দেশভাষার বানানের অদ্বৈতবাদ লইয়া তখন কোনো ভাষা-তাত্ত্বিক পণ্ডিত আলোচনার প্রয়োজন অনুভব করেন নাই। সংস্কৃতে যদি কেহ মাশ লিখিতে গিয়া মাস লিখিয়া ফেলে, তাহা হইলে বৈয়াকরণগণের ভৎর্সনা শাণিত তরবারির মত চতুর্দিক হইতে অপরাধীর শির লক্ষ্য করিয়া উদ্যত হইয়া উঠে। দেবভাষা দেবীর মতই সতর্কভাবে পূজা পাইবার যোগ্য। তাঁহার পূজার অঙ্গহানি হইলেই প্রত্যবায়ের সম্ভাবনা। তাঁহাকে স্পর্শ করিবার অধিকার পাইবার পূর্বে স্নান করিয়া শুচিতা লাভ করিতে হইবে। কিন্তু মানুষী মায়ের কাছে সন্তানের অবাধ অধিকার। সে ধূলা কাদা গায়ে মাখিয়া যদি মায়ের কোলে চড়িয়া বসে তবু কেহ হাঁ হাঁ করিয়া উঠে না।

কিন্তু পাণ্ডিত্য যত বাড়িয়া চলিল, বৈজ্ঞানিক ভঙ্গীতে ভাষার দিকে যতই দৃষ্টিপাত করা হইতে লাগিল, ততই সংস্কৃত শব্দের রূপ নির্দিষ্ট হইতে থাকিল। উচ্চারণে যাহা উচ্ছৃংগি ছিল বানানে তাহাও উৎসর্গ হইতে আরম্ভ করিল, খন এর স্থানে ক্ষণ লিখিয়া অশুদ্ধি-সংশোধন চলিতে থাকিল।

এইরূপ সংস্কৃতনিষ্ঠার আতিশয্য আরম্ভ হইল উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ হইতে। সংস্কৃত পণ্ডিতগণ বাঙ্গালা গদ্যভাষার চর্চা আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা বাঙ্গালাকে প্রায় সংস্কৃত করিয়াই ফেলিলেন। "বাংলা গদ্য সাহিত্যের সূত্রপাত হইল বিদেশীর ফরমাসে এবং তার সূত্রধার হইলেন সংস্কৃত পণ্ডিত, বাংলা ভাষার সঙ্গে যাঁদের ভাশুর ভাদ্রবউয়ের সম্বন্ধ। তাঁরা এ ভাষার কখনো মুখদর্শন করেন নাই।.....তাঁরা সংস্কৃত-ব্যাকরণের হাতুড়ি পিটিয়া নিজের হাতে এমন একটা পদার্থ খাড়া করিলেন যাহার কেবল বিধিই আছে কিন্তু গতি নাই। সীতাকে নির্বাসন দিয়া যজ্ঞকর্তার ফরমাসে তাঁরা সোনার সীতা গড়িলেন।"[৬]

রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি যেমন ভাষার সম্বন্ধে তেমনি শব্দের সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। অন্যত্র এই প্রসঙ্গেই তিনি বলিয়াছেন:

"যদি স্বভাবের তাগিদে বাংলা গদ্য সাহিত্যের সৃষ্টি হইত, তবে এমন গড়াপেটা ভাষা দিয়া তার আরম্ভ হইত না। তবে গোড়ায় তাহা কাঁচা থাকিত এবং ক্রমে ক্রমে পাকা নিয়মে তার বাঁধন আঁট হইয়া উঠিত। প্রাকৃত বাংলা বাড়িয়া উঠিতে উঠিতে প্রয়োজন মতো সংস্কৃত ভাষার ভাণ্ডার হইতে আপন অভাব দূর করিয়া লইত।"[৭]

একদিন বঙ্কিমচন্দ্রও বাঙ্গালা ভাষা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া অনুরূপ মন্তব্য করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন:

"...তখন পুস্তক প্রণয়ন সংস্কৃত ব্যবসায়ীদিগের হাতে ছিল। অন্যের বোধ ছিল যে, যে সংস্কৃত না জানে বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রণয়নে তাহার কোন অধিকার নাই। সে বাঙ্গালা লিখিতেই পারে না।...সুতরাং বাঙ্গালায় রচনা ফোঁটাকাটা অনুস্বারবাদীদিগের একচেটিয়া মহল ছিল। সংস্কৃতেই তাঁহাদিগের গৌরব। তাঁহারা ভাবিতেন সংস্কৃতেই তবে বুঝি বাঙ্গালা ভাষার গৌরব।

৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—শব্দতত্ত্ব।
৭. ,, ,,

যেমন গ্রাম্য স্ত্রীলোক মনে করে যে শোভা বাড়ুক-না-বাড়ুক ওজনে ভারী সোনা অঙ্গে পরিলেই অলংকার পরার গৌরব হইল; এই গ্রন্থকর্তারা তেমনি জানিতেন, ভাষা সুন্দর হউক বা না হউক, দুর্বোধ্য সংস্কৃতবাহুল্য থাকিলেই রচনার গৌরব হইল।"[৮]

বঙ্কিমের সময় হইতেই এই ভাবের পরিবর্তন আরম্ভ হইয়াছে। তাঁহার সময়েই সমালোচকদের মধ্যে দুইটি দল হইয়াছিল দেখিতে পাই। এই দুই দলের মধ্যে প্রাচীনপন্থী যাঁহারা ছিলেন তাঁহারা কিরূপ মত পোষণ করিতেন বঙ্কিমচন্দ্র একস্থলে তাহার উল্লেখ করিয়াছেন:

"একণে বাঙ্গালা ভাষার সমালোচকেরা দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াছেন। একদল খাঁটি সংস্কৃতবাদী। যে গ্রন্থে সংস্কৃতমূলক শব্দ ভিন্ন অন্য শব্দ ব্যবহার হয়, তাহা তাঁহাদের বিবেচনায় ঘৃণার যোগ্য।"

এইভাবে বাঙ্গালা ভাষার দরবারে একটা প্রবল বিতর্কের সৃষ্টি হইল। প্রায় অর্ধশতাব্দী পূর্বে রবীন্দ্রনাথ, তাঁহার জ্যেষ্ঠাগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথ, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রমুখ বিশিষ্ট লেখকগণ এই বিতর্কের অগ্রণী ছিলেন।

বিতর্কের একটি প্রধান বিষয় ছিল বাঙ্গালা ভাষায় সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার। ভিন্ন ভিন্ন পণ্ডিত ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করিতেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বিশুদ্ধ বাঙ্গালা শব্দ যথাসম্ভব অধিক পরিমাণে ব্যবহার করার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি এইরূপ মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, খাঁটি বাঙ্গালা তেল শব্দটি যখন সুপ্রচলিত ও সুপরিচিত তখন তৈল শব্দের প্রয়োগ নিরর্থক। ইহা হইল চরমপন্থীর কথা।

প্রাচীনপন্থী যাঁহারা তাঁহারা তো বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দ ভিন্ন আর কোনো শব্দকেই সাহিত্যে স্থান দিতে নারাজ।

কিন্তু মধ্যপন্থীর দল মধ্যপন্থার আশ্রয় লইলেন। তাঁহারা বলিলেন,— "তেল শব্দ অশ্লীলও নহে অশ্রাব্যও নহে; ভদ্র-সমাজে উহার ব্যবহারে কেহ কুণ্ঠিত বা লজ্জিত হয় না, সুতরাং আমরা সাহিত্যের ভাষাতেও তেলই ব্যবহার করিব। তবে যদি কেহ স্থলবিশেষে লালিত্যের বা সৌষ্ঠবের অনুরোধে

৮. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—বাঙ্গালা ভাষা, বঙ্গদর্শন, জ্যৈষ্ঠ, ১২৮৫।
৯. " " " "

'তৈল' শব্দেরই ব্যবহার করিয়া ফেলেন তাহাতেও তাঁহার প্রতি খড়্গহস্ত হইব না।"[১০]

ত্রিবেদী মহাশয়ের এই মত যে সর্বাধিক সমীচীন তাহাতে সন্দেহ নাই। এইখানেই একটি প্রশ্ন জাগে। সে প্রশ্ন ইতিপূর্বে উত্থাপিত হইয়াছে কি না জানি না।

'তেল' শব্দটি হইল তদ্ভব। ইহার প্রাকৃত রূপ 'তেল্ল'। তৈল হইতে তেল শব্দের যে উদ্ভব হইল তাহার পশ্চাতে ক্রমপরিবর্তনের একটি সুনির্দিষ্ট ইতিহাস আছে। সে হিসাবে তেল এবং তৈল এই দুইটি পৃথক্ শব্দ বলিয়া বিবেচিত হয়, একই শব্দের দুইটি রূপান্তর বলিয়া মনে করা হয় না। ইহা যুক্তিসংগত কথা।

কিন্তু যে সকল নিত্যব্যবহৃত শব্দ সংস্কৃত শব্দের মৌখিক রূপান্তরমাত্র, তাহাদের কি অবস্থা ?

শ্রী ছিরি, বিশ্রী বিচ্ছিরি, প্রসাদ পেসাদ, বিড়াল বেড়াল, স্ফূর্তি ফুর্তি, ইন্দ্র ইন্দির প্রভৃতি শব্দের দ্বিতীয় উদাহরণগুলির কি গতি হইবে ? এমন অসংখ্য শব্দের উল্লেখ করা যায় যেগুলি কার্যতঃ অর্ধতসৎসম কিন্তু বানান তৎসম। নক্ষত্র নোক্‌খত্র, ক্ষমা খমা, আত্মা আঁত্তা, আত্মীয় আঁত্তিয়ো, ব্রাহ্মণ ব্রাম্‌হন, আহ্নিক আন্‌হিক্, মধ্যাহ্ন মোদ্ধান্‌নো, জ্ঞান গ্যাঁন, বিজ্ঞ বিগগোঁ, প্রতিজ্ঞা প্রোতিগগাঁ, শ্রবণ স্রোবোন্ ইত্যাদি।

প্রাকৃত ভাষার আদর্শ অনুসরণ করিলে নোক্‌খত্রো, খমা, আঁত্তা, ব্রাম্‌হোন, আন্‌হিক্, প্রভৃতি ধ্বনিগত বানান ভাষায় গৃহীত হইত এবং এগুলি স্বতন্ত্র শব্দরূপে পরিগণিত হইয়া যাইত। যেমন একই সংস্কৃত শব্দ ভিন্ন ভিন্ন রূপে দৃষ্ট হইতেছে তেমনি, উচ্চারণ অনুসরণ করিলে, একই সংস্কৃত শব্দ ভিন্ন ভিন্ন আধুনিক ইন্দো-আর্য ভাষায় ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করিত।

ইহাতে ভাল হইত কি মন্দ হইত, তাহা বিচার করিবার জন্য এ প্রসঙ্গের অবতারণা নয়। সমস্যাটার উল্লেখ করিতেছি মাত্র।

অর্ধতৎসম শব্দের ব্যবহার ভাষায় খুব বেশী দেখা যায় না। তাহার মূল কারণ এই যে, সংস্কৃত সম্বন্ধে আমাদের সংস্কারটা বড় প্রবল। সংস্কৃতের

১০. রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী—শব্দকথা।

অধীনতা পাশ হইতে মুক্ত হইবার জন্য বর্তমানে আমরা যতই চাঞ্চল্য প্রদর্শন করি না কেন, আমাদের অন্তরের মধ্যে সংস্কৃতানুগত্য বদ্ধমূল রহিয়াছে। চলিত ভাষাতেও আমরা অর্ধতৎসম প্রয়োগ করিতে অত্যন্ত ভয় পাই। আমরা মুখে বিচ্ছিরি বলি, কিন্তু কলমে বিশ্রী না লিখিয়া পারি না। মুখে পিদিম বলিলেও প্রদীপ লিখিয়া লজ্জা রক্ষা করি। মুখে যতই বলি না কেন, কাগজেকলমে ক্ষতি ভিন্ন খেতি বা খোতি লিখিতে পারি না। ইহাতে লাভটা কি হইতেছে?

লাভ কিছু আছে কি না তাহা বিচারসাপেক্ষ, কিন্তু ক্ষতি যে বহুল তাহা প্রত্যক্ষগোচর।

অর্ধতৎসম শব্দও শব্দভাণ্ডারের একটা অঙ্গ তো! ধ্বন্যাত্মক বানানের চলন না হয় না হউক, কিন্তু স্বাভাবিকভাবে যে সকল শব্দের জন্ম হইয়াছে, ধ্বন্যাত্মক বানানের নাম করিয়া সেগুলিকে ভাষার শব্দাবলী হইতে বাদ দেওয়া কি বুদ্ধিমানের কাজ? তৃষ্ণার মূল্য আছে 'তেষ্টা'র মূল্য নাই? ক্ষুধাকে রক্ষা করিব, 'খিদে'কে অগ্রাহ্য করিব?' মহার্ঘ থাকিবে 'মাগ্‌গি' থাকিবে না? শ্যামলার রূপান্তর বলিয়া 'শামলা'কে ত্যাগ করিতে হইবে?'

সংস্কৃতের প্রতি অত্যাসক্তির ফলে শুধু যে একশ্রেণীর শব্দকে লিখিত ভাষায় স্থান দিতেছি না, তাহা নয়; ইহার ফলে আমরা অনেক খাঁটি বাঙ্গালা, এমন কি বিদেশী, শব্দেরও আকৃতির পরিবর্তন করিয়া সংস্কৃতকল্প করিতেছি। উদাহরণ দিলে বক্তব্যটি পরিষ্কার হইবে।

পূজারী, পূজারিণী, পূরবী, পেজী, পুরণো, চুণ, রাণী, দখিণা (দক্ষিণ দিক হইতে আগত) সোণা, কর্ণেল, গবর্ণমেন্ট, তক্তাপোষ, যূঁই, কূয়া, সূতা, তূলি।

একটু লক্ষ্য করিলেই বুঝা যাইবে, উল্লিখিত উদাহরণগুলিতে যে সকল দীর্ঘ ঈ দীর্ঘ ঊ এবং মূর্ধন্য ণ আছে, সেগুলির কোনো সার্থকতা নাই।

পূজা সংস্কৃত শব্দ, কিন্তু 'পূজারী' বাঙ্গালা। তবে প-এ ঊ এবং র এ ঈ দিব কেন? ইহা সংস্কৃত ইন্‌ভাগান্ত শব্দ নয়। বাঙ্গালায় নী প্রত্যয় দিয়া অনেক সময় স্ত্রীলিঙ্গ করা হয়। নি বলাই উচিত, তবে স্ত্রী-প্রত্যয় বলিয়া সুবিধার জন্য নী-ই ধরা গেল। অবশ্য স্ত্রীলিঙ্গে দীর্ঘ ঈ-এর ব্যবহার যখন করিতেছি, তখনও সংস্কৃতের অনুসরণেই করিতেছি,—একথা মনে রাখা উচিত।

যাহাই হউক, তেলিনী মালিনীর মত পূজারির স্ত্রীলিঙ্গে পূজারিনী করিলাম। কিন্তু পূজারিণী কেন করিব? এখানে মূর্ধন্য ণ দিতে যাইব কেন? সংস্কৃতের ষত্ববিধান ণত্ববিধান মতে বাঙ্গালা ভাষা তো চলে না।

তক্তাপোষে আপোষে মূর্ধন্য ষ দিই কেন? পুষ্ ধাতুটা মনের উপর চাপিয়া আছে বলিয়া। অথচ ফারসী ভাষার অনুসারে প্রথমটার বানান পোশ এবং দ্বিতীয়টার বানান পস। সংস্কৃত পোষণের এমনি প্রভাব যে সে আপসকে আপোষ করিয়া ছাড়িয়াছে।

চূর্ণতে দীর্ঘ ঊ ও মূর্ধন্য ণ আছে। তাই বলিয়া 'চুন'কে 'চূণ' বানান করিব কেন? কূপ-এ সূত্র-এ দীর্ঘ ঊ আছে, তাই বলিয়া কূয়া বা সূতায় দীর্ঘ ঊ দিব কি জন্য?

অধিক কি, আমরা এমন সমস্ত বাঙ্গালা শব্দ তৈয়ার করিয়াছি, যাহা দেখিলে অসংস্কৃত বলিয়া মনেই হইবে না। যেমন নির্ভুল, অকাট্য। আমরা রহস্য করিয়া পাঁটাকে পণ্টক বলি। পেটের অসুখ হইলে বলি পৈটিক অবস্থা খারাপ। ব্যাকরণের সঙ্গে সম্বন্ধ না থাকুক, কিন্তু সংস্কৃতের মত দেখাইবার জন্য আমরা রবির বিশেষণে রৈবিক পর্যন্ত ব্যবহার করিয়া থাকি।

আসল কথা সংস্কৃত রূপটাকে আমরা প্রাণ ধরিয়া ছাড়িতে পারি না। মুখে যাহা বলি এবং কানে যাহা শুনি লিখিবার বেলায় যথাসাধ্য সেটা পরিহার করার চেষ্টা করি।

বাঙ্গালীর মধ্যে এমন কি একজনও লোক আছেন যিনি বাঙ্গালাকে বাঙ্গালা উচ্চারণ করেন? বোধ হয় না। কিন্তু বাঙ্গালা বানান করেন এমন লোক অসংখ্য। আমি নিজেও ঐ বানানই লিখি। বঙ্গ রূপটাই এই বিপদের কারণ। এই ব্যাপার সর্বত্র, কিন্তু এই ক্ষেত্রে একটা সুবিধা এই যে, যেমন বাঙ্গালা আছে, তেমনি বাংলাও আছে। তেমনি ব্রাহ্মণের সঙ্গে যদি ব্রাম্হন্ থাকিত, তাহা হইলে আপত্তি করিতাম না। সত্য কথা বলিতে কি, ব্রাহ্মণ ও ব্রাম্হোনের মধ্যে ব্রাম্হোনেরই বাঙ্গালাত্ব অধিক। অথচ এই ধরনের শব্দই সংস্কৃত বানানের আবরণে আত্মগোপন করিয়া তৎসম নামে প্রচারিত হইতেছে।

গদ্য ভাষার জন্মকালে যে সংস্কৃত প্রভাব ছিল ভাষার ক্ষেত্রে যদিও তাহা আজ অনেক পরিমাণে শিথিল হইয়াছে, শব্দাবলীর দিক দিয়া সে প্রভাব

কিছুমাত্র কমে নাই। বরং সেদিক দিয়া আমাদের পণ্ডিতী মনোবৃত্তি দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। তাহার ফলে তৎসম শব্দের যে পরিমাণ ব্যবহার হইতেছে, খাঁটি বাঙ্গালার (অর্ধতৎসমও যাহার অন্তর্ভুক্ত) সে পরিমাণ ব্যবহার হইতেছে না। বস্তুতঃ আমরা যে সমস্ত তৎসম শব্দের ব্যবহার করি তাহার অধিকাংশই তৎসম নয়। আমরা জোর করিয়া তাহাদের তৎসম বলি এবং জোর করিয়া তাহাদের সংস্কৃত বানান দিই।

বানানের ক্ষেত্রে এইরূপ বিশৃঙ্খলা আর কতদিন চলিবে? বর্তমানে কোনো কোনো প্রদেশে শব্দের বানান নির্দিষ্ট করিবার জন্য একটা আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে। এই সময়ে ভারতের সকল ভাষাভাষীর একত্র হইয়া এই গুরুতর বিষয়টির দিকে দৃষ্টিপাত করা আবশ্যক বিবেচনা করি।

মেদিনীপুরের প্রাদেশিক ভাষার উচ্চারণপ্রণালী

কথিত ভাষা বলিতে গেলে এখন আমরা কলিকাতার ভাষাকেই বুঝি। ঐ ভাষাই এখন বঙ্গের আদর্শ ভাষা। এই আদর্শ ভাষা বঙ্গভাষাভাষী জন সাধারণের মধ্যে ক্রমশঃ প্রভাব বিস্তার করিয়া বঙ্গের বিভিন্ন প্রদেশে একই বঙ্গভাষার ভিন্ন ভিন্ন রূপের সংস্কার সাধন করিয়া দিতেছে। ঐ সঙ্গে প্রাদেশিক উচ্চারণপদ্ধতিও আপন আপন বৈশিষ্ট্য ধীরে ধীরে বিসর্জন দিতেছে।

মেদিনীপুর পশ্চিমবঙ্গের একটি বড় জেলা। ভাষাকেন্দ্র কলিকাতা হইতে মেদিনীপুর অধিক দূরে নহে বলিয়া এখানকার ভাষা বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলার ভাষা অপেক্ষা আদর্শ ভাষার অধিকতর সন্নিহিত। বাঁকুড়া শহর ও মেদিনীপুর শহরের ভাষার তুলনামূলক আলোচনা করিলেই তাহা বুঝা যাইবে। কিন্তু যে পরিবর্তনক্রিয়া অল্পকালের মধ্যেই শহরের ভাষার রূপান্তর সাধন করে সেই ক্রিয়া পল্লীগ্রামের মধ্যে তত দ্রুত অগ্রসর হইতে পারে না। তাই মেদিনীপুরের পল্লীভাষায় প্রাদেশিকতা এখনও যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান। শুধু উচ্চারণপ্রণালীতে নয়, শব্দে এবং পদবিন্যাসপ্রণালীতেও এই জেলার বিশিষ্টতা আলোচনা করিবার বিষয়। এই প্রবন্ধে আমরা কেবল উচ্চারণ-প্রণালী সম্বন্ধেই আলোচনা করিব।

মেদিনীপুরের কোনো কোনো অঞ্চলের ভাষা অনেক প্রাচীন গ্রন্থের ভাষার সহিত হুবহু মিলিয়া যায়! ঐ সমস্ত গ্রন্থের ভাষার আকৃতির দিকে লক্ষ্য করিলে বেশ বুঝা যায় যে মেদিনীপুরের ভাষায় প্রাচীন বাঙ্গালার উচ্চারণ-পদ্ধতিই অনেকটা অনুসৃত হয়। 'য' ফলা বা তৎপূর্বরূপ 'ই'কার যুক্ত পদে এই উচ্চারণ লক্ষ্য করিবার বিষয়। কবিকঙ্কণ চণ্ডী হইতে তিনটি ছত্র উদ্ধৃত হইল:

"পুন নাথ যদি বসী উঠিতে সঙ্কট বাসী
মুল্যে না ফিরাতে পারি পাস।"[১]

উপরিউক্ত 'মুল্যে' কথাটি যদি সাধারণ নিয়মে উচ্চারণ করা হয় তাহা

১. ক. ক. চ—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণ, পৃঃ ১২৮

হইলে 'স্লে' এইরূপ শুনাইবে। কিন্তু এখানকার ভাষার সহিত যাঁহার পরিচয় আছে তিনি এই শব্দের উচ্চারণ করিতে বিন্দুমাত্র ক্লেশ বোধ করিবেন না। এখানকার উচ্চারণে 'সু' এবং 'ল্যে'র মধ্যে একটি 'ই' ধ্বনির রেশ আছে এবং 'ল্যে'র 'এ'কারে একটু 'য'র টান রহিয়াছে।

উক্ত পুস্তকেরই এক স্থানে আট দশ ছত্রের মধ্যে 'পাইকালা' ও 'পাকাল্যা' এই দুইটি শব্দ দেখা যায়। 'বিরের পাইকালা দেখি চিন্তেন ঈশ্বরী' এবং 'মাইয়ামৃগ হইয়া দেখি বিরের পাকাল্যা'।[২]

এই স্থলে একই শব্দ দুই ভাবে বানান করা হইয়াছে বলিয়া যে ঐ শব্দ দুই ভাবে উচ্চারণ করা হইত ইহা মনে করিবার কোনো কারণ নাই! কবির (অথবা লেখকের) কানে একটা 'ই' এবং একটা 'য়' শব্দের ঝংকারমাত্র ছিল। লিখিবার সময় তাহা তিনি অত ভাবিয়া প্রয়োগ করেন নাই, পাঠককে কিন্তু একটু চিন্তা করিয়া তাহা পড়িতে হইবে। 'অপিনিহিতি' নামক ধ্বনিবিকার প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষার একটি বৈশিষ্ট্য। পূর্ববঙ্গের বাঙ্গালায় আজিও অপিনিহিতির প্রভাব প্রচুর। মেদিনীপুরের পল্লী অঞ্চলে গেলে দেখা যাইবে অপিনিহিতির প্রভাব পশ্চিমবঙ্গেও আছে।

পুরাতন ভাষার সহিত মেদিনীপুরের ভাষার কি সম্বন্ধ এখন আমরা তাহা আলোচনা করিব না, প্রসঙ্গক্রমে কয়েকটি মাত্র কথা বলা হইল।

মেদিনীপুরের ভাষায় প্রাচীনত্বের ছাপ থাকিলেও ইহা যে কোনো নির্দিষ্ট প্রদেশের ভাষার অনুরূপ তাহা নহে। এই জেলার ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের ভাষা ভিন্ন ভিন্ন আকৃতির। এই জেলার উত্তরে বাঁকুড়া, বর্ধমান; দক্ষিণে বালেশ্বর; পূর্বে হাবড়া, কলিকাতা এবং পশ্চিমে ছোটনাগপুর। এই জেলার ভৌগোলিক অবস্থানের প্রতি লক্ষ্য করিলেই ভাষার উচ্চারণপদ্ধতির বিভিন্নতার কারণ কতকটা অনুমান করা যাইবে। বীরভূম ও বাঁকুড়ার অনুনাসিক ও প্রলম্বিত উচ্চারণ এবং ছোট নাগপুরের পার্বত্য জাতির ও ওড়িষ্যাবাসীদিগের ভাষাগত নানাবিধ বিশিষ্টতা কোথাও বা একক এবং কোথাও বা সংমিশ্রিত হইয়া এখানকার ভাষার বিভিন্ন রূপ ও উচ্চারণ দিয়াছে।

২. ক. ক. চ.—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণ, পৃঃ ১৭৬

উচ্চারণপদ্ধতিতে আদর্শ ভাষার সহিত আলোচ্য ভাষার কি সম্বন্ধ তাহাই একণে আমরা লক্ষ্য করিব।

চলিত ভাষার 'অ'য়ের উচ্চারণ সাধারণতঃ 'ও' হইতে বেশী দূরে নয়। কিন্তু মেদিনীপুরে অনেক কথায় 'অ'য়ের উচ্চারণ অবিকৃত থাকে। ধন, বন, মন জন প্রভৃতি শব্দ কলিকাতায় ধোন, বোন, মোন, জোন এইরূপ হইয়া যায়; কিন্তু এখানে ঐ সমস্ত শব্দে 'অ'কারের স্থান 'ও'কার অধিকার করে নাই।

পদের শেষ অক্ষরের হসন্ত উচ্চারণ না হইলে ওকারান্ত উচ্চারণ হইবে, ইহাই চলিত ভাষার রীতি। কাল, ভাল, গেল, বল, ধর, মার প্রভৃতি শব্দ মনে মনে উচ্চারণ করিয়া দেখুন শেষ বর্ণগুলি ওকারান্ত হয় কি না। আলোচ্য ভাষায় কিন্তু এরূপ স্থলে 'অ'কারের উচ্চারণ অবিকৃত থাকে।[৩]

প্রচলিত ভাষায় বলিও, করিও প্রভৃতি ক্রিয়ার রূপান্তর বোলো, কোরো এইরূপ হয় কিন্তু মেদিনীপুরের কথায় এইরূপ অনুজ্ঞাবাচক ক্রিয়ার ব্যবহার লক্ষিত হয় না। এ স্থলে বল্‌ব, কর্‌ব এইরূপ পদ ভবিষ্যৎ বাচক উত্তম পুরুষের ক্রিয়ার ন্যায় ব্যবহৃত হয়। আমি বা মুই করব এবং তুমি কর্‌ব এই উভয় প্রকার ব্যবহারই এখানে চলিত। উত্তম পুরুষে কেবল ভবিষ্যৎ কাল বুঝায়, মধ্যম পুরুষে ভবিষ্যৎ ও অনুজ্ঞা দুইই বুঝায়, এরূপ স্থলে অন্ত্য 'ব' 'বো' হয় না। কিন্তু ধাতুর প্রথম অকার কোনো কোনো স্থলে ওকারের মত শুনায়।

এখানে 'কর্তব্য' প্রভৃতি শব্দের প্রথম 'অ'কার 'ও'কার হইয়া 'কোর্তোব্য' হয় নাই। যেমন, এখন, তখন প্রভৃতি শব্দের মধ্য অক্ষরে 'অ'কারের প্রভাবই অক্ষুণ্ণ আছে।

কথিত ভাষায় অকারের সহিত ওকারের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তাই অকারের পরই ওকারের উচ্চারণের কথা ধরা যাউক।

আদর্শ ভাষায় 'অ'কার অনেক স্থলেই 'ও'কার হয় কিন্তু 'ও'কারকে কোনো স্থানে 'অ'কার হইতে দেখা যায় না। মেদিনীপুরে 'ও'কারের এই পরিবর্তন দৃষ্টিগোচর হয়। বিনোদ, আমোদ প্রভৃতি বিনদ, আমদ হইয়া যায়। মোটা, গোটা, গোড়া, নোড়া, সোলা, ধোবা প্রভৃতি শব্দের 'ও'কার স্পষ্ট 'অ'কারের

৩. উদাহরণে প্রদত্ত বল, ধর ও মার এই শব্দ তিনটি যথাক্রমে বল্‌, ধর্‌ ও মার্‌ ধাতুর অনুজ্ঞার পদ। তুমি বল (বলহ), ধর (ধরহ), মার (মারহ)।

মত উচ্চারিত* হয়। তবে বিনোদে'র 'ও'কার এবং 'মোটা'র 'ও'কারের উচ্চারণে কিছু প্রভেদ আছে। 'মোটা'র 'ও'কারে স্পষ্ট 'অ' এবং 'বিনোদে'র 'ও'কারে 'অ' এবং 'ও'এর মধ্যবর্তী—বরং 'অ'-কারেরই কাছাকাছি একটা ধ্বনি শ্রুত হয়। কিছু পরেই আমরা দেখিব যে হসন্ত উচ্চারণের পূর্ববর্তী 'ও'কার যদি আদি স্বর হয় তাহা হইলে ঐ 'ও'কারের উচ্চারণ অবিকৃত থাকে। ভুগোল, নিটোল, বিভোর প্রভৃতি শব্দে 'ও'কারের উচ্চারণে কোনো পরিবর্তন হয় না। ঐ শব্দগুলি আলোচনা করিয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে পরবর্তী হসন্তের প্রভাব পূর্ববর্তী 'ও'কারকে অবিকৃত রাখে। পূর্ববর্তী 'ও'কার আদি স্বর হইলে তো কথাই নাই। গোল, ঘোল, মোর প্রভৃতি শব্দ ইহার নিদর্শনস্থল। আদিস্বর না হইলে 'ও'কারের উচ্চারণ কিছু পরিবর্তিত হইয়া যায় বটে কিন্তু একেবারে 'অ'কার হয় না। মেদিনীপুরের প্রাদেশিক উচ্চারণে বিনোদ, আমোদ প্রভৃতি শব্দের 'ও' অ হইয়াও হয় না।

গোপাল, দোকান, বোতল, মোটর প্রভৃতি শব্দের উচ্চারণে 'ও' কারের রেশমাত্র নাই। গপাল, দকান, বতল, মটর এইরূপ হয়। 'ও'কারের পরবর্তী স্বর যদি 'অ' কিংবা 'আ' হয় তাহা হইলে ঐ 'ও' স্পষ্ট 'অ'য়ের মত উচ্চারিত হইবে; এবং 'ও' কারের পরবর্তী বর্ণ 'ই' 'উ' এবং 'ও' হইলে অথবা 'ই' 'উ' বা 'ও'-র সহিত যুক্ত কোনো ব্যঞ্জনবর্ণ হইলে ঐ ওকারের উচ্চারণ সাধারণতঃ অবিকৃত থাকে। লোটিশ, কোকিল, গোয়ুয়া, কোঁহুলি, মোহোর, গোটো, ধোবো প্রভৃতি শব্দ ইহার উদাহরণস্থল।[8]

কথিত ভাষায় 'ও'কারের পর 'ই'কারের প্রয়োগ অতি বিরল। 'ও' কারের পর 'ই' আসিলেই পূর্ববর্তী 'ও'কার 'উ'কার হইয়া যায়, যেমন,—ছোঁড়া-ছুঁড়ি; ঢোল-ঢুলি; পোঁটলা—পুঁটলি; চোর—চুন্নি। নোটিস্ কোথাও কোথাও লোটিস্ এবং কোথাও বা লুটিস্ হয়। আলোচ্য ভাষাতেও ই-কারের পূর্ববর্তী ও-কার উ হইয়া যায়।

প্রচলিত বাঙ্গালায় শুন্, বুন্ প্রভৃতি যে সব ধাতুতে এক 'উ'কার মাত্র স্বরবর্ণ আছে, সে সব ধাতুতে আকারযুক্ত করিয়া বিশেষণের মত ব্যবহার করা হয়, অথবা কর্মবাচ্যে প্রযুক্ত হয়। 'আ' যোগ করিলেই ঐ সমস্ত ধাতুর

৪. গোটো—গুটানো, সংকুচিত; যথা, পা গোটো করে বসি। ধোবো—সাদা।

'উ'কার আদর্শ ভাষায় 'ও'কারে পরিণত হয়। যেমন, শোনা কথায় বিশ্বাস কি; পোড়া মুখে সব ভাল; মেজের শোয়া যায় না ইত্যাদি। আলোচ্য ভাষায় শোনা, পোড়া ইত্যাদি শব্দে 'ও'কার না আসিয়া পূর্বরূপ 'উ'কারই বর্তমান থাকিবে। অন্যথা এই প্রদেশের স্বাভাবিক নিয়মে 'আ' কারের পূর্ববর্তী 'ও' 'অ' হইয়া যাইবে। সেই কারণে পুড়া, শুনা, বুনা, ধুয়া, মুছা প্রভৃতি শব্দের মধ্যে বেগুন-পড়াও শুনিতে পাওয়া যায়। বানরকে কেহ কেহ 'পড়ামুআ' বলে।

শুন্ বুন্ প্রভৃতি ধাতুর ন্যায় একই আকৃতির বিশেষ্য হইতে উৎপন্ন আ-যুক্ত বিশেষণেও আদর্শ ভাষার ন্যায় 'ও' না হইয়া 'উ'কারই থাকিবে। নুন + আ আদর্শ ভাষায় নোনা (যেমন নোনা আতা), আলোচ্য ভাষায় নুনা (যেমন নুনা জল)।

পূর্ববর্তী 'উ'কারের প্রভাবে আদর্শ ভাষায় যেখানে 'ও'কার হইয়া যায়, আলোচ্য ভাষায় সেখানে কোনো পরিবর্তন হয় না। কলিকাতায় খুড়ো, বুড়ো, মুড়ো মেদিনীপুরে খুড়া, বুড়া, মুড়াই থাকে। কলিকাতার বোয়াল এখানে বুয়াল, গোঁয়ার—গুঁয়ার, চোয়াড়—চুয়াড়, মোক্তার—মুক্তার হয়।

'ও'কার যুক্ত যত প্রকার শব্দের আলোচনা করা হইল তাহাদিগকে কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়।

১. গোল, ঢোল, দোল, বোল, মোট, শোর, কোঁড় ইত্যাদি। আলোচ্য ও আদর্শ ভাষায় ইহাদের উচ্চারণ অভিন্ন।

২. মোটা, কোঁড়া, গোলা (ধানের গোলা), খোলা (ভগ্ন মৃৎপাত্র, খুল্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন, 'আ'-যুক্ত বিশেষণ নহে), দোকান, গোপাল, বোতল ইত্যাদি। এই শ্রেণীর শব্দে 'আ'কার বা 'অ'কারের পূর্ববর্তী 'ও'কারের উচ্চারণ 'অ'য়ের অনুরূপ।

৩. শোনা, বোনা, ধোয়া, মোছা ইত্যাদি শুন্, বুন্ প্রভৃতি ধাতু হইতে নিষ্পন্ন পদ। আলোচ্য ভাষায় মূল উচ্চারণ 'উ'কারই বর্তমান থাকে।

৪. বুড়ো, খুড়ো, চুড়ো, পুজো ইত্যাদি।[১] মেদিনীপুর প্রদেশে এই সমস্ত শব্দ 'আ'-কারান্ত আদিরূপেই বর্তমান

১. পুজো—পূজ্ ধাতু হইতে নহে। পূজ্ ধাতু কথিত ভাষায় নাই। কথোপকথনে পূজিল, পূজিতেছি এরূপ প্রয়োগ হয় না। পূজ্ ধাতু কথিত ভাষায় যদি থাকিত, তাহা হইলে থানা বোনা প্রভৃতির মত পোজা পদও থাকিত।

শুন্‌, বুন্‌ ইত্যাদি ধাতু হইতে যে অর্থে কলিকাতার ভাষায় শোনা, বোনা এবং মেদিনীপুরে শুনা, বুনা ইত্যাদি হয় সেই অর্থে ফিঁক্‌, কিন্‌, লিখ্‌, চির্‌ প্রভৃতি ধাতু (যাহাতে এক'ই' মাত্র স্বর আছে) হইতেও কলিকাতার মত ফেঁকা, কেনা, লেখা, চেরা ইত্যাদি না হইয়া ফিঁকা, কিনা, লিখা, চিরা এইরূপ হইবে।

কলিকাতার সেয়ানা এখানে সিয়ানা বা সিয়ান।[২] শেয়াল এখানে শিয়াল হয়। শেয়াল, পেয়ারা প্রভৃতি শব্দের ন্যায় 'য়া' যুক্ত শব্দে উক্ত 'য়া'র পূর্ববর্তী (আদর্শ ভাষায় ব্যবহৃত) 'এ'কার স্থলে এখানে 'ই' থাকে। বেয়াই, বেয়ান, পেঁয়াজ, মেয়াদ, খেয়াল, চেয়ার, কেয়ার প্রভৃতি শব্দ মেদিনীপুরে বিয়াই, বিয়ান, পিঁয়াজ, মিয়াদ, খিয়াল, চিয়ার, কিয়ার এইরূপ হয়।[৩] অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের গ্রন্থে পেঁয়াজ খেয়াল প্রভৃতি শব্দের সহিত ব্যারামকেও একই শ্রেণীভুক্ত দেখিতে পাই। চলিত বাঙ্গালায় প্যায়দা—পেয়াদা, প্যাঁজ—পেঁয়াজ ইত্যাদির মত ব্যারাম শব্দেরও আর এক রূপ 'বেয়ারাম' আছে, ইহা তিনি ঐ গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। এখানে পিঁয়াজ, পিয়াদা, ইত্যাদির মত ব্যারামের রূপান্তর বিয়ারাম থাকা উচিত ছিল; কিন্তু এরূপ উচ্চারণ শোনা যায় না।

বুড়া, খুড়ার মত পিসা, মিছা, কিরা প্রভৃতি শব্দের আকারেরও এখানে কোনো পরিবর্তন হয় না। কলিকাতায় কিন্তু ঐ 'আ'কার 'এ' হইয়া পিসে, মিছে ইত্যাদি পদ হয়।

বিয়ে ও বে এই দুইটি শব্দই কলিকাতায় প্রচলিত। মেদিনীপুরে বিয়া ও ব্যা।

২. মেদিনীপুরের ভাষায় কোথাও কোথাও প্রাকৃত শব্দ অবিকৃত ভাবে এবং কোথাও বা প্রাকৃতের ঠিক পরবর্তী রূপটিই দেখিতে পাওয়া যায়। সজ্ঞান—সিআন (কৃষ্ণকীর্তন) সিয়ান (আলোচ্য ভাষা)—সেয়ান (আদর্শ)। শৃগাল—সিআল—শিয়াল (আলোচ্য)—শেয়াল (আদর্শ)।

৩. চলিত ভাষায় এই সমস্ত শব্দের আর একটি করিয়া রূপ আছে; যথা, বেই, বেন, প্যাঁজ, ব্যাদ ইত্যাদি। Suniti Kumar Chatterji, 'The Origin and Development of the Bengali Language', p. 584.

আদর্শ ভাষায় 'ঋ'কার 'এ'কার হইয়া কেষ্ট, চন্নামেত্ত প্রভৃতি শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। আলোচ্য ভাষায় 'ঋ' অধিকাংশ স্থলেই 'ই' হয়। যথা ;—কিষ্ট, চন্নামিত্ত ইত্যাদি।

তৎসম শব্দে আদি ব্যঞ্জন বর্ণে 'র'ফলা থাকিলে সেই 'র' আদর্শ ভাষায় 'এ' হইয়া যায় ; আলোচ্য ভাষায় কিন্তু তাহা 'অ' বা 'যা' উচ্চারণে পরিণত হয় এবং পরবর্তী বর্ণের দ্বিত্ব সম্পাদন করে। যথা ;—প্রণাম আদর্শ ভাষায় পেন্নাম এবং আলোচ্য ভাষায় পন্নাম বা প্যান্নাম। ঐরূপ ব্রত—(আদর্শ) বেত্তো, (আলোচ্য) বত্ত বা ব্যাত্ত। প্রহ্লাদ—(আদর্শ) পেল্লাদ, (আলোচ্য) পল্‌ল্‌হাদ বা প্যাল্‌ল্‌হাদ। কেহ কেহ বানানকে অনুসরণ করিয়া 'প্রহল্লাদ' উচ্চারণ করে।

অধ্যাপক বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় তাঁহার 'The History of the Bengali Language' গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "The inital sound of এ in indigenous Bengali words can be represented by 'a' in mat." 'এ'কারের এরূপ উচ্চারণ কিন্তু তৎসম শব্দের বেলা হইবে না। "...The initial এ in the তৎসম words does not become the normal Bengali এ।" আলোচ্য ভাষা সম্বন্ধেও এই দুই নিয়ম খাটে। এক, ফেন বা ফেনা, বেলা এবং হেলা এই চারিটি শব্দ দ্বিতীয় নিয়মের মধ্যে পড়ে না দেখিয়া গ্রন্থকার উহাদিগকে তদ্ভব বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "We see that the old এক became এক্ক in Prakrita, and so the newly formed Bengali word এক is not, inspite of its physical identity, identical with the original Sanskrit form." পরবর্তী তিনটি শব্দের উচ্চারণ আদর্শ এব আলোচ্য ভাষায় এক রকম ; কিন্তু 'এক' শব্দের উচ্চারণ আলোচ্য ভাষায় দ্বিতীয় নিয়মের গণ্ডীর মধ্যে পড়ে। এখানে ইহার উচ্চারণ 'য়্যাক' নহে 'এক'। এখন 'এক' শব্দ বরাবর সংস্কৃত হইতে আগত তৎসম শব্দ কিন তাহা ভাবিবার বিষয়। এখানে 'ব্যাগ' প্রভৃতি কতকগুলি শব্দের 'যা' 'এ' হইয়া যায়, আবার 'এ'কারও পরিবর্তিত হইয়া কোথাও কোথাও 'যা' হয়। যেমন, চেক—চ্যাক।

মেদিনীপুরে পদমধ্যস্থ বা পদান্তস্থিত 'ন' বা 'ণ' এর উচ্চারণে কখনও কখনও একটু বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। আলোচ্য ভাষায় উল্লিখিত স্থলে 'ণ' এবং

'ন' এ একটু 'ড়' মিশ্রিত আছে। এই জেলায় দক্ষিণ অঞ্চলেই 'ন' ও 'ণ' এর এইরূপ উচ্চারণ শোনা যায়। রাণী—রাড়িঁ >রাঁড়িঁ ; পানি >পাড়িঁ > পাঁড়িঁ। কোণ কড়ঁ >কঁড়ঁ, আঁধার কঁড়ে বুসুন্থ কেঁড়ে গো? চিক্কণ—চিকঁড়ঁ, সোনা সঁড়াঁ।

আলোচ্য অঞ্চলে পদমধ্যস্থ এবং পদান্তস্থিত 'ল' শব্দের উচ্চারণেও 'ড়' এর মিশ্রণ আছে। বৈদিক সংস্কৃতেও বৈয়াকরণগণ 'ড়' 'ল'-এর অভেদ লক্ষ্য করিয়াছেন। বেদের 'অগ্নিমীড়ে' এবং 'অগ্নিমীলে' স্মরণ করুন। কোল-কোড়, পো কোড়ে কর‍্যা আইল। 'ন', 'ণ' এবং 'ল'-এ 'ড়' এর এই মিশ্রণ দক্ষিণ অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যেই প্রচলিত দেখিয়া বিশ্বাস হয় যে ওড়িয়ার প্রভাবই ইহার কারণ।

'য' এর আসল উচ্চারণ বাঙ্গালায় নাই বলিলে হয়। শব্দের মধ্যবর্তী হইলে ইহার চলিত উচ্চারণ অনেকটা 'অ'য়ের মত হয় এবং কোনো বর্ণে যুক্ত হইলে সেই বর্ণের দ্বিত্ব করিলে যেরূপ উচ্চারণ হয় সেইরূপ শুনায়। মেদিনীপুরে এই উচ্চারণ কতকটা আসলের কাছাকাছি। আদর্শ ভাষায় 'ই'কারের পর 'য়া' (যাহার উচ্চারণ 'আ') থাকিলে উভয়ে মিলিয়া 'এ' হয়; যেমন বলিয়া—ব'লে, করিয়া—ক'রে। মেদিনীপুরে ঐ স্থলে 'এ' না হইয়া 'য়া' উচ্চারণ হইবে এবং 'য়া'র পূর্বে একটা 'ই' শব্দের রেশ থাকিবে। 'খেয়ে' এই কথাটির উচ্চারণ মেদিনীপুরে 'খাইয়া' এবং 'খায়া'র মধ্যবর্তী; ঐরূপ যেয়ে—যা'য়া, শুয়ে-শু'য়্যা, মেয়ে—মা'য়া এইরূপ হইবে। ক'র‍্যা, খা'য়্যা শব্দ যে প্রাচীন করিআঁ, খাইআঁ প্রভৃতি শব্দের ঠিক পরবর্তী রূপ সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোনো কারণ দেখা যায় না। 'ই' কারের পর 'আ' থাকিলে 'য়' স্বাভাবিক ভাবেই আসে। এই সমস্ত স্থলেও তাহাই হইয়াছে।

'ন' ও 'ল' এর সম্বন্ধে কয়েকটি কথা যথাস্থানে বলা হয় নাই। মেদিনীপুরে 'ল' অনেক ক্ষেত্রে 'ন' এ পরিণত হয়। মুই মনে কল্লে (ক'ল্লে) সব কত্তে পারি। লিখা—নিখা; লক্ষ্মী—নক্ষ্মী।

আবার 'ন' ও 'ল' হইয়া যায়, যেমনও নহবৎ—লহবৎ, নালা—লালা; নূতন—লৈতন।

পরিশেষে 'স' এর উচ্চারণ সম্বন্ধে একটি পার্থক্যের কথা উল্লেখ করি। 'স' এর উচ্চারণ প্রায় সর্বত্র আদর্শ ভাষারই মত। আদর্শ ভাষার

তিন 'স' এরই উচ্চারণ তালব্য 'শ'য়ের অনুরূপ। অবশ্য 'ত' 'থ' এর পূর্বে দন্ত্য 'স'-এর এবং 'ট' 'ঠ' এর পূর্বে মূর্ধন্য 'ষ'-এর উচ্চারণ কি আদর্শ এবং কি আলোচ্য উভয় ভাষাতেই কতকটা অবিকৃত। 'স' এর সম্বন্ধে উভয় ভাষার পার্থক্যের কথা যাহা বলিতেছিলাম তাহা এই :

মেদিনীপুর শহরে হাড়ী, ডোম প্রভৃতি তথাকথিত ইতর শ্রেণীর লোকদের মধ্যে তিন 'স' এরই একরূপ বিকৃত দন্ত্য উচ্চারণ শোনা যায়। দক্ষিণ মেদিনীপুরে 'শ-ষ-স'-এর দন্ত্য উচ্চারণ বিশেষ প্রচলিত। এরূপ উচ্চারণ কলিকাতার নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোকগণের মধ্যেও শুনিতে পাওয়া যায়।

এই ধরনের উচ্চারণ গানেই স্পষ্ট বুঝা যায়। স্থানীয় যাত্রার দলে হাড়ী ডোম প্রভৃতি শ্রেণীর বালকগণকে নৃত্য গীত শিক্ষা দিয়া উহাদিগকে নর্তকীর অংশ অভিনয় করিতে দেওয়া হয়। উহাদের গান একবার শুনিলেই এ কথার যাথার্থ্য উপলব্ধি হইবে। স্থানীয় রাজকর্মচারিগণ কয়েক দিবস পূর্বে এক অভিনয় অনুষ্ঠান করেন। পূর্বোক্ত যাত্রাদলের বালকগণকে এই অভিনয়ে নর্তকীর অংশ দেওয়া হইয়াছিল। তাহাদের গীত 'বঁধু এস হে' এখনও অনেক শ্রোতার কানে বাজিতেছে সন্দেহ নাই।[৪]

৪. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, মেদিনীপুর শাখার সপ্তদশ বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত

নাম রহস্য

কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন দিলে তাহার দৃষ্টিশক্তি ফিরে না জানিয়াও হয়তো কোন স্নেহান্ধ পিতা চক্ষুহীন পুত্রের একদিন ঐ নাম দিয়াছিল। সন্তানের বাহিরের অন্ধতা ঢাকিতে গিয়া সে যে আপনার অন্তরের অন্ধতাই জগতের কাছে প্রকাশ করিতেছে এ কথা হয়তো সেদিন তাহার মনে উদয় হয় নাই।

বস্তুতঃ নাম মানুষের বাহিরের পরিচয়মাত্র। অন্তরের সঙ্গে তাহার কোনো সম্বন্ধই নাই, তাই শেক্‌স্‌পীয়র একদিন বলিয়াছিলেন, "নামে কি আসে যায়? গোলাপকে যে নামই দাও না কেন তাহার গন্ধের কোনো তারতম্য হইবে না।" কথাটি নিতান্তই সত্য। গোলাপ-হাস্‌নুহানা, মল্লিকা-মালতী, ডেজি-ড্যাফোডিলকে ক১-ক২, খ১-খ২, গ১-গ২ এই রকম নাম দিলে কাজ যে চলে না এমন নয়। বরং কাহারও কাহারও কাজ তাহাতে সহজসাধ্যই হয়, বিশেষতঃ বৈজ্ঞানিকের। কিন্তু মনুষ্যসমাজে বৈজ্ঞানিক অপেক্ষা অবৈজ্ঞানিকের সংখ্যাই বেশী। তাহারা আবার নামের মধ্যে কোথাও বা মাধুর্য এবং কোথাও বা গাম্ভীর্য আশা করিয়া বসে। এমন ব্যক্তিও আছেন যাঁহারা পুত্র-কন্যার নামকরণের জন্য অভিধানের শরণাপন্ন হন, তাহাতেও ফল না ফলিলে শেষ পর্যন্ত শিশুটিকে সঙ্গে লইয়া সম্বাসিক কবিগুরুর শ্রীচরণ সন্দর্শনে যাত্রা করেন।

কবিগুরুর কথাই যখন উঠিল তখন নাম সম্বন্ধে তাঁহার মতামত কি সেটা বলি। তিনি বলেন;—"মানুষের মাধুর্য...সর্বাংশে সুগোচর নহে, তাহার মধ্যে অনেকগুলি সূক্ষ্ম সুকুমার সমাবেশে অনির্বচনীয়তার উদ্রেক করে। তাহাকে আমরা কেবল ইন্দ্রিয় দ্বারা পাই না, কল্পনা দ্বারা সৃষ্টি করি। নাম সেই সৃজনকার্যের সহায়তা করে। একবার মনে করিয়া দেখিলেই হয় দ্রৌপদীর নাম যদি উর্মিলা হইত তবে সেই পঞ্চবীরপতিগর্বিতা ক্ষত্রনারীর দীপ্ত তেজ এই তরুণ কোমল নামটির দ্বারা পদে পদে খণ্ডিত হইত।"

কাব্যের নায়ক নায়িকা বা ক্ষুদ্র বৃহৎ চরিত্রগুলি কবি নিজেই সৃষ্টি করেন। কবি তাহাদের যেমনটি করিয়া আমাদের সম্মুখে ধরিতে চাহেন ঠিক তেমনটিই যে আমরা দেখি তাহা নহে। আকৃতি প্রকৃতির যে বিবরণ দিয়া কবি তাঁহার নায়কের মূর্তি রচনা করেন আমরা কল্পনার রঙে তাহাকে আর একটু রাঙাইয়া লই। এই সকল ক্ষেত্রে নামও চরিত্রের অন্যতম পরিচয়। অনসূয়া এবং

প্রিয়ংবদা এই দুইটি নাম দিয়াই কবি কালিদাস শকুন্তলার দুই সখীর চূড়ান্ত পরিচয় দিয়াছেন। শার্ঙ্গরব ও শারদ্বতের নাম সম্বন্ধেও এই কথাই বলা যায়। কালকেতু, শ্রীমন্ত, চন্দ্রশেখর, কপালকুণ্ডলা, বিক্রম, সুমিত্রা প্রভৃতি নামগুলিও যথেচ্ছাসঞ্জাত নয় পরন্তু চিন্তাসম্ভূত।

সত্যই রচনার মধ্য দিয়া যে রস পরিবেষণ করা হয় সুনির্বাচিত নাম তাহার পাত্রস্বরূপ। কনককটোরা আধার হিসাবে নিতান্ত নিন্দনীয় না হইলেও সিরাজি সেবনের পক্ষে পেয়ালাই যে সমধিক প্রশস্ত একথা ওমর খৈয়ম হইতে অত্যাধুনিক খুনখারাপী গজলগান রচয়িতাগণ পর্যন্ত কেহই অস্বীকার করিতে পরিবেন না বলিয়া আমার বিশ্বাস।

হাস্যরসের ক্ষেত্রে নামের দাম আরও অধিক। সেইজন্য যেখানে 'নিমাই' চন্দ্রও যথেষ্ট তিক্ত প্রতিপন্ন হন না সেখানে 'গদাই' নামে দ্বিতীয় বার নামকরণ করার প্রয়োজন হয়। কাছে পিঠে না পাইলে অন্তত বাগবাজারের চৌধুরীদের বাড়ী হইতে শ্রীমতী কাদম্বিনীকে পালকি করিয়া আনাইয়া লইতে হয়। রসিক-দাদার রসিকতা এবং ভাঁড়ুদত্তের ভাঁড়ামি এক শ্রেণীর না হইলেও দুইজনের নামে ও আচরণে হাস্যরসের প্রচুর উপাদান পাওয়া যায়। চিরকুমার সভার এই রসিকদাদা নৃপ ও নীরর জন্য যে দুইটি 'ফাঁড়া'র আয়োজন করিয়াছিলেন তাঁহাদের সহিত পাঠকের অবশ্যই পরিচয় আছে। তাঁহাদের "একটি বিসদৃশ লম্বা, রোগা, বুটজুতা পরা, ধুতি প্রায় হাঁটুর কাছে উঠিয়াছে, চোখের নীচে কালি পড়া, ম্যালেরিয়া রোগীর চেহারা, বয়স বাইশ হইতে বত্রিশ পর্যন্ত যেটা খুশি হইতে পারে।" ইঁহার নাম মৃত্যুঞ্জয় গাঙ্গুলী। দ্বিতীয় ব্যক্তিটি "বেঁটে-খাটো, অত্যন্ত দাড়িগোঁফসংকুল, নাকটি বটিকাকার" এবং আরও নানাবিধ শারীরিক সুলক্ষণসমাক্রান্ত—ইঁহার নাম দারুকেশ্বর মুখোপাধ্যায়।

যাহার যে নাম তাহাকে সে নামে না ডাকিয়া অন্য নামে ডাকিলে খুশী হয় না—বিশেষতঃ ঐ নূতন নামকরণের মধ্যে যদি তাহার শারীরিক, ব্যাবহারিক বা আর কোনো প্রকারের কিছু ত্রুটির সম্বন্ধে ইঙ্গিত থাকে। যাহার নাম বিশেষ সুশ্রাব্য নয় সেও তাহার পরিবর্তন চায় না। "এমন কি যাহার নাম ভূতনাথ তাহাকে নলিনীকান্ত বলিলে তাহার অসহ্য বোধ হয়।" আর নামটাকে বিকৃত করিলে যে পীড়া দেওয়া হয় তাহার যন্ত্রণা যে কিরূপ অসহনীয় তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। 'গিন্নি' গল্পের শিবনাথ পণ্ডিতের এ তত্ত্বটি

ভাল রকম জানা ছিল। বাচনিক যতগুলি অস্ত্র তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইত এইটি তাহার মধ্যে সর্বাপেক্ষা নিদারুণ। তাই শশিশেখরকে ভের্টকি এবং আশুকে 'গিন্নি' নাম দেওয়ায় তাহারা যেরূপ কষ্ট পাইয়াছিল পানিবেত ও বিছুটির জ্বালাও তাহার তুলনায় অনেক আরামের।

শুধু গ্রন্থোক্ত পাত্র-পাত্রীর নামই নয় গ্রন্থের নাম সম্বন্ধেও গ্রন্থকাররা মধ্যে মধ্যে যথেষ্ট চিন্তা করেন। চিন্তার বিষয় ইহাতে সন্দেহ নাই। পুস্তকের নামকরণ বিষয়ে লেখকেরা সাধারণতঃ কয়েকটি বিষয়ে দৃষ্টি রাখেন। কেহ বা নামের মধ্য দিয়া গ্রন্থোক্ত বিষয়বস্তুটির পরিচয় দিয়া দেন। যেমন;— মেঘনাদবধ, বৃত্রসংহার, সরল বাঙ্গালা অভিধান, ধাতুরূপকল্পদ্রুম। কেহ বা আলোচ্য বিষয়ের মূল সূত্রটি ধরাইয়া দিয়াই নিশ্চিন্ত হন। যেমন,— কৃষ্ণকান্তের উইল, বৈকুণ্ঠের খাতা, নীলদর্পণ। পাত্র-পাত্রীর নাম লইয়া গ্রন্থের নাম দেওয়াটাই বোধ হয় সর্বাপেক্ষা অধিক প্রচলিত। ইহার উদাহরণ উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু প্রধান পাত্র বা পাত্রীর কোনো প্রকার বৈশিষ্ট্য অথবা আলোচ্য বিষয়ের মূল ভাবের প্রতি লক্ষ্য করিয়া যে সংকেত-মূল নাম গ্রন্থের পরিচয় প্রদান করে তাহাই এ যুগে জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া মনে হয়। এরূপ নাম নির্বাচনে যথেষ্ট দক্ষতার প্রয়োজন এবং সে দক্ষতার অভাব অনেকস্থলেই পরিস্ফুট। 'ক্ষুধিত পাষাণ' 'নষ্টনীড়' 'অচলায়তন', 'আলালের ঘরের দুলাল', 'পণ্ডিতমশাই', 'দত্তা', 'পরিণীতা', 'অরক্ষণীয়া', 'বলিদান' প্রভৃতি নামে গ্রন্থকারদের যে নাম-নির্বাচনের নৈপুণ্য দেখিতে পাওয়া যায় তাহা সর্বত্র সুলভ নহে।

পুস্তকের প্রথম নাম পরিবর্তন করিয়া পরবর্তী সংস্করণে অন্য কোনো নাম দিলে পাঠকের মনে স্বতঃই কৌতূহল জাগে। মনে হয়, প্রথম নামে লেখক যে ভ্রম করিয়াছিলেন দ্বিতীয় নামে তাহার সংশোধন করিতে চাহিয়াছেন। কালির আঁচড় না দিলে অশুদ্ধও শুদ্ধ বলিয়া চলিয়া যায় কিন্তু দাগ পড়িলে খাঁটিকেও দাগী মনে হয় এবং কাটা শব্দটির পঙ্কোদ্ধার, করিবার জন্য মন তখন উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠে। সেদিন যখন শ্রীমতী 'দত্তা' 'বিজয়া' নামে নাট্যশালায় পদার্পণ করিলেন তখন হঠাৎ মনে হইল 'দত্তা' নামটা দিয়া শরৎচন্দ্র কি এত দিন অনুতাপ করিতেছিলেন? অথবা, উপন্যাসের নাট্যরূপে নামেরও পরিবর্তন আইন অনুসারে অবশ্যকর্তব্য? দত্তার মধ্যে যে সুহৃদ্ম এবং সুনিপুণ

ইঙ্গিতটি রহিয়াছে, বিজয়া নামে তাহা নাই। পিতা বনমালী কন্যার ডাক নাম দিয়াছিলেন বিজয়া—দৈবজ্ঞ শরৎচন্দ্র রাশিনাম লিখিয়াছিলেন দত্তা। আজ তাঁহারই দেওয়া দত্তা নাম প্রত্যাহার করায় তাঁহাকে দত্তাপহরণ পাপে লিপ্ত হইতে হইল। 'ললিতা'র প্রচুর লালিত্য সত্ত্বেও 'পরিণীতা' নাম বর্জন করিয়া রঙ্গমঞ্চে উঠিতে দিতে আমাদের ইচ্ছা নাই। 'অরক্ষণীয়া'র 'জ্ঞানদা' সম্বন্ধেও আমাদের এই মত।

রবীন্দ্রনাথ 'রাজা ও রানী'র সংস্কৃত রূপকে যে 'তপতী' নামে অভিহিত করিয়াছেন তাহার মধ্যে একটা সুস্পষ্ট অর্থ লক্ষ্য করা যায়। সুমিত্রার আত্মত্যাগের মধ্য দিয়া এই নাটক পরিণতির পথে অগ্রসর হইয়াছে। 'রাজা' ও 'রানী' উভয়েই প্রধান নহে। কাজেই 'রাজা' ও 'রানী'র মধ্যে কাহারও নাম দিতে হইলে 'রানী'র নামটার প্রতিই দৃষ্টি পড়ে। কিন্তু 'রানী' বস্তুতঃ রানী নহেন তাই শুধু 'রানী' নামটাও যথেষ্ট বিবেচিত হয় নাই। সুমিত্রা নাম রাখা যাইতে পারিত কিন্তু তপতীর মধ্যে যে সংকেতটি রহিয়াছে শুধু সুমিত্রার মধ্যে সেটি নাই। পরিবর্তিত নামের প্রসঙ্গে 'শেষরক্ষা'র কথা মনে আসে। 'গোড়ায় গলদ' হইলে সর্বত্র শেষ রক্ষা হয় না। কিন্তু যেখানে বলি শেষরক্ষা হইয়াছে সেখানে গোড়ায় গলদ হইয়াছিল এ ধারণা আপনা হইতেই মনে জাগে। গোড়ায় গলদ ট্রাজেডি, শেষরক্ষা ট্রাজেডিমূল কমেডি।

গল্পে-উপন্যাসে, কাব্যে-নাটকে নাম স্বয়ং খানিকটা কাজ করে। কিন্তু যাহাকে প্রতিদিন দুই বেলা চোখের সম্মুখে দেখিতেছি যাহার নাড়ী এবং হাঁড়ি —এ দুয়েরই খবর আমার সুবিদিত তাহার নাম যাহাই হউক না কেন কি আসে যায়? কল্পনা-জগতে নামের যে দাম বস্তুজগতে সে দাম নাই ইহা মানিতেই হইবে। মাসের দোসরা তারিখে গৃহিণীর যে মূর্তি দৃষ্টিগোচর হয় তিরিশে তারিখে তাহার কি কোনো পরিবর্তন হয় না? কিন্তু সেদিনও আপনাকে মঞ্জুভাষিণী নিদেনপক্ষে মঞ্জু বলিয়াই ডাকিতে হইবে। ভাবিয়া দেখুন তো কি রকম বিড়ম্বনা!

এই যে ঘরবাড়ী, দোকান দেবালয়, ব্যাঙ্ক বাজার, যাত্রা থিয়েটার প্রভৃতি সব কিছুরই নিত্য নূতন নামকরণ হইতেছে তাহার মধ্য দিয়া সমগ্র দেশের নবপ্রবর্তিত রুচি ও মনোভাবের একটা বিচিত্ররূপ দেখা যায় মাত্র। এখন শু-স্টোর্সের স্থান অধিকার করিয়াছে বিনামা-বিপণি বা পাদুকা-প্রতিষ্ঠান,

আইডিয়াল কাফের জায়গায় দেখা যায় আদর্শ পেয়াবাস, থিয়েটারের নাম হইয়াছে নাটমন্দির বা রংমহল বা প্রেক্ষাগৃহ। কিন্তু পাদুকা, পেয়, ও প্রেক্ষ্যের কতটুকু তারতম্য হইয়াছে তাহার সংবাদ গোচর করাইবার ভার লেখক লইতে রাজী নহেন। সম্ভবতঃ তাহার প্রয়োজনও নাই। সেদিন কায়স্থসভার উদ্যোগে একটি বিরাট ভোজের অনুষ্ঠান হয়। জনৈক বন্ধু ভোজ খাইয়া আসেন এ হতভাগ্যের অদৃষ্টে একটি ভোজ্যতালিকা জুটে। তাহার মধ্যে হঠাৎ একটি নামের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। ভোজ্য হিসাবে বস্তুটি কি রকম উপাদেয় হইবে নাম দেখিয়া তাহা প্রথমে বুঝিতে পারি নাই, বন্ধুর সাহায্যে বুঝিয়াছিলাম। উক্ত খাদ্যের নামটি হইতেছে 'ললনাঙ্গুলিকা'। বঙ্গভাষার প্রতি বাঙ্গালীর যে অত্যুগ্র অনুরাগ লক্ষিত হইতেছে তাহার জন্য ভাষাজননী অবশ্যই কৃতজ্ঞ থাকিবেন। কিন্তু সে কথা এখন থাকুক।

মোটকথা, এই দেখা যাইতেছে যে বাস্তব জগতে নামটা নামধারীর চিহ্নমাত্র, পরিচয় নয়। নাম যদি কাহারও পরিচয় দেয় তো সে নামদাতার, নামের অধিকারীর নয়। সেই হিসাবে সামাজিক জীবনের ইতিহাসে নামের মূল্য অনেক।

রবীন্দ্রনাথ এক স্থলে বলিয়াছেন;—"সেই প্রাচীন ভারতখণ্ডটুকুর নদী-গিরিনগরীর নামগুলিই বা কি সুন্দর!……নামগুলির মধ্যে একটি শোভা সম্ভ্রম শুভ্রতা আছে। সময় যেন তখনকার পর হইতে ক্রমে ক্রমে ইতর হইয়া আসিয়াছে, তাহার ভাষা ব্যবহার মনোবৃত্তির যেন জীর্ণতা এবং অপভ্রংশতা ঘটিয়াছে। এখনকার নামকরণও সেই অনুযায়ী।" সত্যই মানুষের ব্যবহার মনোবৃত্তি রীতিনীতির সহিত নামের সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। কোনো সময়ের কতকগুলি নাম আলোচনা করিয়া সেই সময়ের অনেকটা পরিচয় পাওয়া যায়।

ভারতবর্ষীয় হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে দেবদেবীর নামে পুত্রকন্যার নামকরণের প্রথা আবহমান কাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। ইচ্ছায় অনিচ্ছায় ভগবানের নাম উচ্চারণ করিবার ইহা অপেক্ষা সহজ উপায় আর নাই। কলিযুগে নাম-কীর্তন ভিন্ন আর ভবসংসার হইতে উদ্ধার পাইবার দ্বিতীয় তরণী নাই। মৃত্যুকালে গঙ্গানারায়ণকে স্মরণ নাও হইতে পারে কিন্তু পুত্রের নাম যদি

গঙ্গানারায়ণ হয় তাহা হইলে মায়ামুগ্ধ নর সে নাম একবার উচ্চারণ না করিয়া পারিবে না।

দেবতাকে পূজা করিয়া যে সন্তান লাভ হয় তাহাকে উমাপদ, শ্যামাচরণ, কালীকিঙ্কর নাম দিয়া ইষ্টদেবতার প্রতি আমরা কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করি। বিনা পূজাতেও যাঁহারা ধরাধামে অবতীর্ণ হন পিতামাতা তাঁহাদেরও দেবপ্রসাদ বলিয়াই মনে করেন।

যাহাকে বড় বেশী ভালবাসি তাহাকে হারাইবার ভয়ে মানুষের মন সর্বদাই আতঙ্কিত থাকে। কয়েকটি নামের মধ্যে এই আশঙ্কার চিহ্ন সুস্পষ্ট।

'রাখহরি', 'থাকমণি' প্রভৃতি নামের সঙ্গে বাঙ্গালীর পরিচয় অবশ্যই আছে। মৃতবৎসা বা নিঃসন্তান জননীর কোনো সন্তান হইলেই মনে ভয় হয়—ভগবান্ যদি ইহাকেও কাড়িয়া লন। তাই তাঁহাকে ডাকিয়া প্রার্থনা জানানো হয়, তুমিই ইহাকে রক্ষা কর। প্রতিবার সন্তানের নামোচ্চারণ প্রসঙ্গে ভগবানের চরণে এই প্রার্থনাই পৌঁছিতে থাকে।

মৃতবৎসার মনে হয়;—মায়ের স্নেহ না পাইয়াই তাঁহার স্নেহের দুলাল, তাঁহার আদরের দুহিতা অভিমানে কোল খালি করিয়া গিয়াছে। এবার আর তাহাকে ছাড়া হইবে না। তাই তাহার ভূমিষ্ঠ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই 'থাক' বলিয়া অভ্যর্থনা করেন।

দুর্ভাগিনী রমণীর কোনো পাপের ফলেই হয়তো তাঁহার পুত্রশোক। এ হয়তো পূর্বকৃত দুষ্কর্মেরই ফল।—এরূপ চিন্তাও মধ্যে মধ্যে জননীর মনকে প্রপীড়িত করে। তাহারই ফলে 'এককড়ি' 'দুকড়ি' 'তিনকড়ি' প্রভৃতি নামের উৎপত্তি। যে ব্যক্তি ব্যাঙ্কের টাকা ভাঙ্গে আইনে তাহারই সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইতে পারে কিন্তু সে যদি তাহার ঘর বাড়ী অন্যের নামে বেনামী করিয়া রাখে তাহা হইলে সরকারের তাহাতে হস্তার্পণ করিবার উপায় থাকে না। 'এককড়ি' 'দুকড়ি' 'বেচারাম', 'কেনারাম' প্রভৃতি নামের মধ্যে এইরূপ আইন বাঁচাইবার চেষ্টা দেখা যায়। দুর্ভাগিনী জননী ভাবেন;—আমার সন্তান বলিয়াই ভগবান্ ইহাকে কাড়িয়া লন, কিন্তু আমি যদি ইহার মাতৃত্বের অধিকার অপরের হস্তে তুলিয়া দিই তাহা হইলে আর তিনি ইহাকে গ্রহণ

করিবেন না। তাই ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নবজাত শিশুটিকে তিনি ধাত্রীহস্তে তুলিয়া দেন। পরে অবশ্য এক কড়া কি দুই কড়া কড়ি দিয়া ধাত্রীর নিকট হইতে তাহাকে পুনরায় ক্রয় করিয়া লন। কিন্তু যেহেতু মাতৃত্বের অধিকার একবার ধাত্রীকে দেওয়া হইয়াছে, সেইহেতু অমুকের সন্তান বলিয়া বিধাতা তাহাকে আর হরণ করিতে পারেন না। এখন চিত্রগুপ্তের জন্মরেজেস্টারিতে ঐ শিশুর মাতৃনামের স্থলে ধাত্রীনাম লিখিত হইয়া গিয়াছে। আইন মানিয়া চলিতে হইলে উহার উপর তাঁহার কোনো হাত নাই। তবে রাজার আইন এবং প্রজার আইন সব সময়ে একরূপ হয় না।

মানুষের মত দেবতারও সুন্দর জিনিসের প্রতি বড় লোভ। রসগোল্লা দেখিলে আমাদের জিহ্বা সরস হয় কিন্তু যদি কেহ বলিয়া দেয় উহা অনেক দিনের বাসী, পচিয়া দুর্গন্ধ হইয়া গিয়াছে, তাহা হইলে আর সেদিকে মন দিবার প্রয়োজন বোধ করি না। সন্তানের জননী ভাবেন ভগবানের মনোভাব আমাদেরই মত। তাহারই ফলে 'ফেলারাম', 'গুয়ে', 'মেথরা' প্রভৃতি নামের উৎপত্তি। এ প্রসঙ্গের আলোচনা পূর্বেও হইয়াছে। পৃষ্ঠা ৬-৭ দ্রষ্টব্য।

কোনো পাঠশালার গুরুমহাশয় একটি পড়ুয়ার নাম দিয়াছিলেন 'নিমাই'। নিমাইয়ের এক সহপাঠী গুরুমহাশয়কে একদিন তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। তিনি বলিলেন,—"আরে তা-ও জানিস না, ও যে আমায় রোজ একটি করিয়া নিমের দাঁতন আনিয়া দেয়।" নিমাইয়ের সহপাঠী তৎক্ষণাৎ জিজ্ঞাসা করিল,—"গুরুমহাশয়, আমি যদি প্রত্যহ একটি করিয়া জামের দাঁতন আনিয়া দিই?" গুরুমহাশয় আর কোনো জবাব দিয়াছিলেন কি না জানি না, কিন্তু একথা সত্য যে তাঁহার 'নিমাই' নামকরণ অসংগত হয় নাই। বস্তুতঃ 'নিমাই' শব্দ 'নিম' হইতেই আসিয়াছে। মৃত্যুদেবতাও মানুষের মত তিক্ত-দ্রব্যের কাছে ঘেঁষিবেন না—এইরূপ মনোভাব লইয়াই জননী সন্তানের দীর্ঘ-জীবন কামনায় এইরূপ নাম দিয়া থাকেন। সাড়ে চারিশত বৎসর পূর্বে একদিন শচীমাতাও নবজাত সন্তানের এই নামই দিয়াছিলেন। পল্লীগ্রামে 'তিতারাম' নামও শুনিয়াছি।

অবস্থাবিশেষে মানুষ আবার সন্তান চায় না। 'আন্নাকালী', 'ক্ষান্তমণি'

প্রভৃতি নামই তাহার প্রমাণ। কৌলীন্য-প্রথার দুঃখময় ইতিহাসের সহিত এই নামগুলির কিরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তাহা একবার চিন্তা করিয়া দেখুন।)

তাই বলি, কাব্যের নাম নামধারীর পরিচয়। আর জীবন্ত মানুষের নাম তাহার সমাজের প্রতিবিম্ব।

আজকাল তরুণ সমাজে নামের মধ্যাংশ ছাঁটিয়া মধ্যপদলোপী করার রেওয়াজ হইয়াছে। শুধু তাহাই নয়, এখন যুক্তাক্ষরবিহীন সুকোমল সুললিত নামেরও বহুল প্রচলন হইতেছে। তাহার ফলে কি হইয়াছে এবং কি হইতে পারে সে আলোচনা 'কচি সংসদ'-এই হইয়া গিয়াছে। এখানে পুনরালোচনা নিরর্থক। কিন্তু ইহা হইতে অতি আধুনিক বাঙ্গালী সমাজের যে মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা খুব সতেজ এবং সমুন্নত বলিয়া মনে হয় না।

কন্যার দুর্ভাগ্য আশঙ্কা করিয়া বাঙ্গালী পিতামাতা 'সীতা' নাম রাখিতে ভয় পান। ইহা হৃদয়ের কোমলতা এবং ভীরুতা উভয়েরই পরিচায়ক। আজকাল দুই একটি বাড়ীতে এই নামটির চলন দেখিতেছি। কেহ কেহ সংস্কার মানেন না জনসমাজে ইহা দেখাইবার জন্যই এরূপ নাম রাখেন, এমনও শোনা যায়। কিন্তু তাহা না-ও হইতে পারে।

ইভা, নিভা প্রভৃতি কয়েকটি নামের কোনো অর্থ বুঝা যায় না, কিন্তু সন্ধান করিলে প্রয়োগের কারণ আবিষ্কার করা কঠিন হইবে না। 'ইভ' শব্দের অর্থ হস্তী। স্ত্রীলিঙ্গে রূপ হয় 'ইভী'। ধরিয়া লইলাম 'ইভা'ই হইল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও কোন্ মাতা হস্তিনীবাচক শব্দ দিয়া কন্যাকে অভিহিত করিবেন? এমন হইতে পারে, বর্ণসংক্ষেপ ও শ্রুতিমাধুর্যহেতু ইভাননী শব্দের দ্বিতীয়ার্ধ বাদ দেওয়া হইয়াছে।

কিন্তু তাহাতেও সমস্যার সমাধান হয় না, কারণ ইভানন মাতার পছন্দ হইলেও জামাতার তৎপ্রতি বিশেষ অনুরাগ না-ও জন্মিতে পারে। 'নিভ' শব্দের অর্থ সদৃশ। অন্য শব্দের সহিত যুক্ত না হইলে ইহার তো প্রয়োগই হয় না। হয়তো বা জ্যেষ্ঠ ভগিনীর নাম বিভা; সাদৃশ্য এবং অনুপ্রাস বজায় রাখিবার জন্য মধ্যমা এবং তৎপরবর্তী দুই ভগিনীর নাম দেওয়া হইয়াছে 'ইভা' ও 'নিভা'। তাহার পর ধীরে ধীরে নিরর্থক হইলেও নামগুলি প্রচলিত হইয়া গিয়াছে। প্রাচীন সাহিত্যেও এই ধরনের নামের নিদর্শন পাওয়া

যায়। ময়নামতীর গানে দেখি, রাজা গোবিন্দচন্দ্র এক রাজার দুই কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন। তাহাদের এক জনের নাম চন্দনা অপরের নাম ফন্দনা। পদুনার বোন অদুনার নাম লইয়া ভাষাতাত্ত্বিকগণের মতভেদ থাকিতে পারে কিন্তু চন্দনার বোন ফন্দনার কি আর কোনো গতি আছে? স্বস্তিক শব্দটি আমাদের তেমন পরিচিত নয় অথচ শব্দটি সংস্কৃত। এই শব্দটি জার্মানির ফেরত যখন Swastika রূপে ভারতবর্ষে দেখা দিল তখন 'স্বস্তিকা' বলিয়া আহ্বান করিলাম। পদান্তস্থিত a বাঙ্গালায় আ হইয়া গেল। ফলে মেয়েরা 'স্বস্তিকা'দেবী নাম গ্রহণ করিয়া নূতন করিয়া আর্যা হইলেন। 'সবিতা' দেবী নামও এযুগে শোনা যাইতেছে। কিন্তু হায়, কে বলিয়া দিবে যে সবিতা কবিতার সহোদরা নয়?

সর্বভারতীয় লিপি

রাষ্ট্রভাষার সমস্যা স্বাধীনতালাভের পূর্বেও ছিল, এখনও আছে। এখন তাহার গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভাষাসমস্যা সম্পর্কে আলোচনা প্রত্যালোচনা কম হয় নাই। এ প্রসঙ্গে হিন্দী এবং হিন্দুস্থানীর নামই বেশী শোনা গিয়াছে, এখনও যাইতেছে।

হিন্দী এবং হিন্দুস্থানীর মধ্যে কতখানি মিল আর কতখানি পার্থক্য সে আলোচনার প্রয়োজন এখানে নাই। তবে এক দিক দিয়া উভয়ের মিল আছে এবং সে মিলটার কথা প্রাসঙ্গিক বলিয়া উল্লেখ করিতেছি। হিন্দী এবং হিন্দুস্থানী—এই দুই ভাষাই নাগরী লিপির সাহায্যে লেখা হয়। হিন্দুস্থানীর জন্য উর্দুও (ফারসী-আরবী লিপি) ব্যবহৃত হয়। কিন্তু বর্তমানে হিন্দুস্থানের অধিবাসীদের মধ্যে যতজন উর্দু ব্যবহার করেন নাগরী ব্যবহার করেন তাহার অপেক্ষা বেশীসংখ্যক লোক।

রাষ্ট্রভাষা হিসাবে বাঙ্গালার যোগ্যতার কথাও উঠিয়াছে। বাঙ্গালা ভাষার অতীত যেমন গৌরবময় বর্তমানও তেমনি সমুজ্জ্বল। বাঙ্গলা সাহিত্য আপন ঐশ্বর্যগৌরবে বিশ্বসাহিত্যের দরবারে স্থান পাইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র এবং অন্যান্য বহু বাঙ্গালী সাহিত্যিকের রচনা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে সাগ্রহে অনূদিত হইতেছে। ভাবপ্রকাশের বাহন হিসাবে বাঙ্গালা যে শক্তিশালী ভাষা তাহার তো এই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। স্বয়ং গান্ধীজী বাঙ্গালা ভাষার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া শেষ বয়সে ইহার অনুশীলন আরম্ভ করেন এবং মৃত্যুদিন পর্যন্ত অভিনিবিষ্ট পাঠার্থীর ন্যায় বাঙ্গালা শিক্ষা করেন। বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করা তিনি কর্তব্য বলিয়া গণ্য করিয়াছিলেন। মাতৃভাষা হিসাবে কত লোক ইহা ব্যবহার করে সেদিক দিয়া গণনা করিলে সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে ইহার স্থান সপ্তম এবং ভারতবর্ষের মধ্যে প্রথম, অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এ তথ্য বহুদিন পূর্বেই সপ্রমাণ করিয়াছেন। সুতরাং বাঙ্গালাকে রাষ্ট্রভাষা করা হউক এ দাবি অসংকোচে উত্থাপন করা চলে। অনেকে তাহা করিয়াছেন।

ইংরাজী ভাষাই এখনও রাষ্ট্রভাষার আসনে অধিষ্ঠিত আছে। আন্তঃপ্রাদেশিক যোগরক্ষার সেতুরূপে ইংরাজীর ব্যবহার আজও অব্যাহত।

সম্প্রতি একাধিক প্রসঙ্গে ভারত সরকারের শিক্ষাসচিব এরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, ভারতবর্ষের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে উচ্চ-শিক্ষার বাহন হিসাবে ইংরাজীর ব্যবহার চিরস্থায়ী হইবে না। কোনো একটি ভারতীয় ভাষা ইংরাজীর স্থান অবশ্যই গ্রহণ করিবে। তবে এই পরিবর্তনের জন্য অতিশয় ব্যস্ত হওয়া অসংগত। তাঁহার মতে এই পরিবর্তনের জন্য পাঁচ বৎসর সময় লাগিবে। ইতিমধ্যে নিম্নতর শিক্ষার জন্য প্রাদেশিক ভাষার ব্যবহার চলিতে থাকুক।

শিক্ষামন্ত্রীর অভিমত অনুধাবনযোগ্য। সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষার বাহন হইবে একটি ভারতীয় ভাষা। এই ভাষাটি কি হইবে সে কথা তিনি বলেন নাই। কিন্তু সে ভাষা যাহাই হউক না কেন, তাহাই রাষ্ট্রভাষা হইবে —(অথবা রাষ্ট্রভাষা বলিয়া যাহা নির্দিষ্ট হইবে তাহাই উচ্চতর শিক্ষার বাহন-রূপে ব্যবহৃত হইবে)—এরূপ অনুমান করা অস্বাভাবিক হইবে না। এ অনুমান যদি অসংগত বলিয়া মনে না করি তাহা হইলে স্বভাবতঃই আরও একটা অনুমান আসিয়া পড়ে,—ভারত সরকার রাষ্ট্রভাষা সম্বন্ধে এখনও মতিস্থির করিতে পারেন নাই। সম্প্রতি প্রকাশিত একটি সংবাদে দেখিলাম সম্মিলিত জাতি সংসদে (UNO) হিন্দুস্থানী ভারতের সাধারণ ভাষা বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। ভারতবর্ষে অনেকে হিন্দুস্থানীর ব্যবহার শুরু করিয়াছেন, অনেকে হিন্দীর প্রচার আরম্ভ করিয়াছেন। কোনো কোনো প্রাদেশিক সরকার হিন্দীভাষায় সরকারী কাজকর্মও পরিচালনা করিতেছেন। অ-হিন্দীভাষীরাও অনেকে হিন্দী বলিতে পড়িতে ও শিখিতে চেষ্টা করিতেছেন। বাঙ্গালা দেশেই দেখিতে পাইতেছি অনেক বিদ্যালয়ে (যেখানে প্রায় সকল ছাত্র বা ছাত্রী বাঙ্গালী) নূতন করিয়া হিন্দী ক্লাস খুলিয়া হিন্দী শিক্ষাদানের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে। সত্য হউক, মিথ্যা হউক, আমরা যেন বিশ্বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছি—হিন্দীটাই রাষ্ট্রভাষা হইয়া গিয়াছে। আমরা যখন বাঙ্গালা ভাষার পক্ষ লইয়া বলি, তখন যেন ঔচিত্যবোধেই বলি, মনে মনে বোধ হয় খুব জোর পাই না।

ভারতের রাষ্ট্রভাষা বাঙ্গালাই হউক, আর হিন্দী—হিন্দুস্থানীই হউক, লিপি কি হইবে তাহা আর এক সমস্যা। সর্বভারতের জন্য যদি একটি সর্ব-ভারতীয় ভাষার প্রয়োজন হয়, একটি সর্বভারতীয় লিপিও যে আবশ্যক

তাহাতে সন্দেহ নাই। বরং সর্বভারতীয় একটি লিপির প্রয়োজনই সর্বাগ্রে অনুভব করি। কারণ কি বলিতেছি।

ভারতবর্ষে ভাষাবাহুল্য যে আন্তঃপ্রাদেশিক মিলনের পক্ষে অন্যতম অন্তরায় তাহা আমরা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকি। প্রদেশ বিভাগের জন্ত ভাষাকেই ভিত্তিস্বরূপে গ্রহণ করিবার নীতি কংগ্রেস কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে। তাহার প্রধান কারণ নিশ্চয় এই যে, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে রীতি-নীতি আচার-ব্যবহার শিক্ষা-সংস্কৃতি প্রভৃতির দিক দিয়া স্বাতন্ত্র্য নিতান্তই অল্প; যেটুকু আছে তাহাও এত অস্পষ্ট এবং অনির্দিষ্ট যে তাহার ভিত্তিতে প্রদেশের সীমা নিরূপণ অনায়াসসাধ্যও নহে সুসংগতও নহে। সেই কারণেই এদেশের সীমানির্ধারণের উপায় হিসাবে ভাষার উপরেই নির্ভর করা আবশুক হইয়া পড়িয়াছে।

ভারতবর্ষের প্রাদেশিক ভাষাসমূহের মধ্যে পার্থক্য আছে সত্য। কিন্তু সে পার্থক্য যত অধিক বলিয়া আমরা কল্পনা করি বস্তুতঃ তত অধিক কি না তাহা বিচার করিয়া দেখিবার বিষয়।

ভারতে প্রচলিত প্রধান ভাষাসমূহের মূল এক। আর্য জাতি ভারতে প্রথম প্রবেশের সময় যে ভাষায় নিজেদের মনোভাব প্রকাশ করিতেন, ঋগ্বেদে যে ভাষার নিদর্শন স্থায়িরূপে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে, তাহাই আজিকার ভারতীয় প্রধান ভাষাসমূহের আদি জননী। এক হাজার বৎসর পূর্বেও হিন্দী, বাঙ্গালা, গুজরাটী, মারাঠী প্রভৃতি ভাষার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ছিল না। এবং এই সকল ভাষা যে সব প্রাকৃত-অপভ্রংশ হইতে উৎপন্ন. হাজার বছর পূর্বেকার সেই সকল ভাষার ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে মিলই ছিল বেশী। বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাসের ছাত্রগণ জানেন, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় যখন নেপাল হইতে আনিয়া হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা প্রকাশ করিলেন, তখন পণ্ডিতসমাজে মতবিরোধ দেখা গেল। যাঁহারা ঐ দোহার ভাষাকে পুরাতন হিন্দী বলিয়া মনে করিয়া-ছিলেন বিদ্বৎসমাজে তাঁহাদের নামও শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করা হইয়া থাকে। আজ যাহা বাঙ্গালা বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে, তখন ঐ প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণ যে তাহাকে বাঙ্গালা বলিয়া মানিয়া লইতে দ্বিধাবোধ করিয়াছিলেন তাহার অবশু সংগত কারণ ছিল। কারণটা আর কিছু নয়। সেটা এই যে নয় দশ

শতাব্দী পূর্বে ভারতের ভাষাসমূহের মধ্যে মিল এতই অধিক ছিল যে, তাহাদের পার্থক্য নির্ণয় করা সহজ ছিল না। ইতিমধ্যে রূপান্তর অনেক বেশী হইয়াছে। মনুষ্যজীবনের সঙ্গে সঙ্গে ভাষার মধ্যেও জটিলতা বাড়িয়াছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ভারতীয় আর্যভাষাগুলির মধ্যে এমন ঐক্য আছে যে, এক প্রদেশের অধিবাসীর পক্ষে অন্য প্রদেশের ভাষা একেবারে বিদেশী ভাষার মত দুরধিগম্য হইবে না। এই সকল প্রাদেশিক ভাষার মধ্যে বহুসংখ্যক তৎসম শব্দের ব্যবহারও আছে। এক প্রদেশের ভাষা অন্য প্রদেশের কাছে যে নিতান্ত অপরিচিত ঠেকে না, ইহাও তাহার অন্যতম কারণ।

ভাষা বুঝিতে অসুবিধার প্রধান কারণ ধ্বনিবৈশিষ্ট্য। যে-ভাষা আমাদের অপরিচিত নহে, তাহাও বুঝিতে অনেক সময় কষ্ট হয় কেন? উচ্চারণ-পার্থক্যই তাহার কারণ। একজন বাঙ্গালীর মুখে যে ইংরাজী বুঝি, একজন খাঁটি ইংরাজের মুখে সেই ভাষাই দুর্বোধ হয়। তাহারও কারণ অপরিচিত উচ্চারণ। এই উচ্চারণবৈশিষ্ট্যের জন্য মাতৃভাষাও অনেক সময় বুঝিতে পারি না। নোয়াখালি বা শ্রীহট্টের লোক বাঙ্গালা ভাষাতেই কথা বলে। কিন্তু বর্ধমানবাসী বাঙ্গালীর পক্ষে তাহার অর্থগ্রহণ সব সময় সুকর হয় না। কিন্তু কানের কাজ যদি চোখের উপর ছাড়িয়া দিই, তাহা হইলে অনেক অসুবিধা কাটিয়া যায়। বাঙ্গালা অক্ষরে যখন শ্রীহট্ট বর্ধমানে চিঠির আদান প্রদান হয় তখন আর অর্থবোধে বাধা হয় না।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে প্রচলিত আর্য ভাষাগুলির মধ্যে অনেক মিল থাকিলেও এক প্রদেশের অধিবাসীর পক্ষে অন্য প্রদেশের ভাষা বুঝিতে অসুবিধা কেন হয়, তাহা দেখা গেল। যে উচ্চারণপার্থক্যের জন্য সে অসুবিধা হয়, তাহা কিছুটা দূরীভূত হইলেই বোঝা সহজ হয়, তাহারও প্রমাণ পাইয়াছি। কাশীর কোনো পণ্ডিত যদি ধীরে ধীরে হিন্দীতে কথা বলেন, তাহা আমরা, বাঙ্গালীরা, বুঝিতে বিশেষ কষ্ট বোধ করি না। উড়িষ্যায় গিয়া দেখিয়াছি, সেখানকার লোকে যে ওড়িয়া কথা বলিতেছে, অতি দ্রুত না বলিলে, তাহাও একরকম বুঝিতেছি। আর আমার বাঙ্গালা বুঝিতেও তাহাদের বেগ পাইতে হইতেছে না। গুজরাটী, মারাঠী প্রভৃতির সহিত আমাদের যোগ অল্প বলিয়াই তাহাদের ভাষা হয়তো কানে শুনিয়া বুঝিতে কষ্ট হইবে। কিন্তু এখানেও যদি কানের কাজ চোখের উপর ছাড়িয়া দিই, দেখিব সেসব ভাষাও

আমরা কিছু কিছু বুঝিতে পারিতেছি। আমরা, বাঙ্গালীরা, হিন্দী শিক্ষা করি কয়জন? কিন্তু মোটামুটি হিন্দী বুঝিতে পারি অনেকে। ধীরে ধীরে উচ্চারণ করিলে সহজে বুঝি, দ্রুত বলিলে অল্পস্বল্প বুঝি। কিন্তু নাগরী লিপি জানা থাকিলে লেখা পড়িতে অসুবিধা হয় না। পড়িয়া কাজ চালানো যায়। হিন্দী-ভাষী যে কোনো শিক্ষিত লোক নাগরী হরফে সাধু ভাষায় লিখিত বাঙ্গালা বুঝিতে অসুবিধা বোধ করিবেন না বলিয়া আমার বিশ্বাস।

উল্লিখিত কয়েকটি অনুচ্ছেদে যাহা বলিতে চাহিয়াছি, তাহার তাৎপর্য এই যে, একটি সাধারণ লিপিকে সর্বভারতীয় ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট করা যদি সম্ভব হয়, তাহা হইলে ভাষাবাহুল্যের জন্য বর্তমানে যে অসুবিধা ভোগ করিতেছি তাহার অনেকটা কমিয়া যাইবে। অতঃপর সর্বভারতীয় ব্যবহারের জন্য যদি কোনো রাষ্ট্রভাষা নির্দিষ্ট হয় তো ভালই। একদিন না একদিন তাহা হইবেই। তখন আন্তঃপ্রাদেশিক যোগের পথ আরও প্রশস্ত হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। যতদিন তাহা না হয়, ততদিন এই প্রস্তাবিত সাধারণ লিপির সাহায্যেই আমরা প্রাদেশিক মিলনের প্রাথমিক ভূমিকা করিয়া রাখি না কেন! চীনদেশে রাষ্ট্রনৈতিক বিবাদ-বিসংবাদ কিছু কম নয়। তথাপি সেখানে যে জাতিগত একতা দেখিতে পাই একলিপির প্রচলন তাহার অন্যতম কারণ। ভারতবর্ষে তাহা করা অসম্ভব বলিলেই স্বীকার করিব কেন?

এখন প্রশ্ন এই: কোন্ অক্ষরকে এই সাধারণ লিপিরূপে ব্যবহার করা যাইবে? রোমক লিপির কথা ইতিপূর্বে বহুবার উত্থাপিত হইয়াছে। অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় বিদ্বৎসভা হইতে শুরু করিয়া সাহিত্যসভা পর্যন্ত বিভিন্ন স্থানে রোমকলিপির দাবি পেশ করিয়াছেন, এখনও করিতেছেন। তাঁহার মত ব্যাবহারিক বুদ্ধি এবং অখণ্ডনীয় যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু জনসাধারণের কাছে বৈজ্ঞানিক বিচার অপেক্ষা ভাবাবেগের আবেদন অধিকতর প্রবল। কাজেই পণ্ডিতসমাজের নিকটে সুনীতিবাবুর মতটার অবস্থা দাঁড়াইয়াছে এইরূপ: মত ভাল কিন্তু কাজে লাগানো কঠিন। যাঁহারা এ মতকে সম্পূর্ণ সমর্থন করেন তাঁহাদের সংখ্যাও কম, শক্তিও অধিক নয়। কিন্তু অধ্যাপক মহাশয় হাল ছাড়িবার পাত্র নহেন, তিনি হাল ছাড়েন নাই। তাঁহার আশা—হয়তো একদিন দেশে শুভবুদ্ধির উদয় হইবে।

রোমক লিপির যখন এই অবস্থা, তখন আর কোন্ লিপির শরণাপন্ন হওয়া যায়? রোমক লিপির পর স্বভাবতঃই নাগরী লিপির কথা আসে ভারতবর্ষের প্রদেশসমূহের মধ্যে ভাষাগত যোগাযোগ রক্ষার পক্ষে ইহার যোগ্যতাও অল্প নয়। কোনো কোনো দিক্ দিয়া রোমানের অপেক্ষাও অধিক।

১. নাগরী লিপি বিদেশীয় নহে। (ক) ভারতীয় আর্যভাষার প্রাচীনতম লিপির নাম ব্রাহ্মী লিপি। এই লিপিই আর্যাবর্তে তিনটি রূপ ধারণ করে। উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষে ইহার যে রূপ হয় তাহার নাম শারদা দক্ষিণ-পশ্চিম এবং মধ্যভারতে ব্রাহ্মী যে রূপান্তর ধারণ করে, তাহার নাম হয় নাগর। ভারতের পূর্বাঞ্চলে এই লিপির যে রূপ হইল তাহার নাম হইল কুটিল। ভারতে প্রচলিত প্রত্যেকটি আর্যভাষারই লিপি ব্রাহ্মী লিপির উল্লিখিত তিনটি রূপের কোনো-না-কোনো একটি হইতে উদ্ভূত হইয়াছে।

(খ) ভারতবর্ষে মালয়ালম্, তামিল, তেলুগু, কানাড়ী প্রভৃতি যতগুলি দ্রাবিড়ী ভাষা প্রচলিত আছে। তাহাদেরও লিপি ব্রাহ্মী হইতে উদ্ভূত। সুতরাং আর্যভাষার অন্যান্য লিপির ন্যায় এই সকল দ্রাবিড়ী ভাষার লিপিও নাগরীর সহিত ভগিনীসম্বন্ধে সম্বদ্ধ।

২. (ক) আর্যভাষাভাষী সমগ্র ভারতবর্ষে যে বর্ণমালা ব্যবহৃত হয় নাগরী বর্ণমালার সহিত তাহার কোনো অনৈক্য নাই। অর্থাৎ ওড়িয়া, বাঙ্গালা গুজরাটী, গুরুমুখী, প্রভৃতি আর্যগোষ্ঠীর সকল ভাষারই বর্ণমালা এক—অ হইতে ঔ স্বরবর্ণ, ক হইতে হ ব্যঞ্জন বর্ণ।

(খ) দ্রাবিড়ভাষী দক্ষিণ ভারতের বর্ণমালার সঙ্গেও নাগরী বর্ণমালার কোনো অনৈক্য নাই। অক্ষরের নাম, সংখ্যা এবং ক্রম প্রায় একই।

সুতরাং ভাষার দিক্ দিয়া অল্প-বিস্তর বিভিন্নতা থাকিলেও শতকরা ৯৩ জন ভারতীয়ের বর্ণমালা অভিন্ন অর্থাৎ নাগরী বর্ণমালার সমান।

৩. হিন্দী যাহাদের মাতৃভাষা তাহারা নাগরী লিখে। হিন্দী যাহাদের মাতৃভাষা নয় অথচ গৌণভাষারূপে ইহার ব্যবহার করে—যে হিসাব ধরিয়া ডাঃ চট্টোপাধ্যায় প্রায় ২৫ কোটি আর্যভাষাভাষীর মধ্যে ১৪ কোটি লোককে হিন্দীভাষী বলিয়াছেন—তাহারাও অনেকে নাগরী লিপিই ব্যবহার করিয়া থাকে। মৈথিলী ভাষার বই নাগরীতে ছাপানো হইতেছে। গুজরাটীর

স্বতন্ত্র লিপি থাকিলেও, নাগরীর সহিত তাহার পার্থক্য অত্যন্ত অল্প। বস্তুতঃ এমন একজন লোকও খুঁজিয়া পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ যে গুজরাটী জানে অথচ নাগরী পড়িতে পারে না। বোম্বাই প্রদেশে গুজরাটীভাষী লোকের সংখ্যা অল্প নয়। কিন্তু বিজ্ঞাপনে, প্রাচীরপত্রে, স্টেশনের নামের বোর্ডে—সর্বত্রই নাগরীর চলন।

৪. হিন্দী যাহাদের মাতৃভাষাও নয় এবং গৌণভাষা হিসাবেও যাহারা হিন্দী ব্যবহার করে না এমন অনেক লোকে নাগরী ব্যবহার করে, অন্ততঃ নাগরী লিপি লিখিতে পড়িতে শিখে। সংস্কৃত ভাষা যাহারা পড়ে তাহাদের মধ্যে এমন অল্প লোককেই পাওয়া যাইবে নাগরী লিপি যাহাদের নিকট অপরিচিত। বাঙ্গালাদেশেই তাহার দৃষ্টান্ত আছে। বাঙ্গালা দেশের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সপ্তম শ্রেণী হইতে সংস্কৃত পড়ানো হয় নাগরী লিপির পুস্তকের সাহায্যে। সুতরাং বাঙ্গালা দেশ সম্বন্ধে একথা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে, এই প্রদেশের অত্যল্পশিক্ষিত লোকও—অর্থাৎ যাহারা অন্ততঃ সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত পড়িয়াছে—নাগরী লিপির সহিত পরিচিত। লিখিতে না পারিলেও পড়িতে পারে এমন লোকের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়।

দক্ষিণ ভারতেও—যেখানে হিন্দীর প্রচলন নাই বলিলেই হয় এবং যেখানকার ভাষার সহিত হিন্দীর তেমন কোনো যোগ নাই—সংস্কৃতচর্চার সুযোগে নাগরী অল্পবিস্তর পরিচিত।

৫. ইতিপূর্বে নাগরী জানার সুযোগ না ঘটিলেও যে কোনো আর্যভাষাভাষী অথবা তামিল তেলুগু প্রভৃতি দ্রাবিড়-ভাষাভাষী শিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে নাগরী লিপি আয়ত্ত করা কঠিন নহে। ১ ও ২ সংখ্যক কারণ দ্বারা এ মন্তব্য সমর্থিত হইবে।

এখন যদি স্বীকার করিয়াই লই যে সর্বভারতীয় লিপি হিসাবে নাগরীর দাবিই অগ্রগণ্য, তাহা হইলে অতঃপর আমাদের কর্তব্য কি হইবে?

সকল প্রদেশের শিক্ষিত জনসাধারণকে সর্বভারতীয় লিপিরূপে নাগরী লিপি ব্যবহার করিবার প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া দিতে হইবে। ইহার জন্য প্রচার আবশ্যক। নাগরীপ্রচারিণী সভা সম্ভবতঃ এদিক দিয়া কিছু কাজ করিতেছেন। নাগরীপ্রচারিণী সভা ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রদেশে জনসাধারণের মধ্যে আপন অস্তিত্ব অনুভূত করাইতে পারিয়াছেন কিনা জানি না,

বোধ হয় পারেন নাই। কিন্তু সেটা করাই সর্বাগ্রে দরকার। বিভিন্ন প্রদেশবাসী বিভিন্ন ভাষাভাষী শিক্ষিত কর্মিদল সংগ্রহ করিয়া তাহাদের সাহায্যে প্রচার করিতে পারিলে প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা বৃদ্ধি পাইবে; যদি কেহ ইহাকে দলীয় প্রতিষ্ঠান বলিয়া মনে করে তো সে ধারণা মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হইবে। লিপিসম্পর্কে সকল প্রদেশের পণ্ডিতমণ্ডলীর মতামত সংগ্রহ, সংকলন এবং সমালোচনা করাও এই সভার অন্যতম কর্তব্য হইবে। সকল পক্ষের মতামত সকলের কাছে তুলিয়া ধরাই ঔদার্যের পরিচায়ক। নাগরীপ্রচারিণী সভা অথবা দুই একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠানের উপরেই সমস্ত দায়িত্ব আরোপ করিলে ঠিক হইবে না। শিক্ষিত জনসাধারণকে এ বিষয়ে অবহিত হইতে হইবে। দেশের শিক্ষকসমাজ এদিকে অনেক সাহায্য করিতে পারেন। প্রাথমিক চারিটি শ্রেণীতে ইংরাজী পড়ানো বন্ধ হইয়া গেল। ইংরাজীর জন্য বিদ্যালয়ের সময় কম যাইত না। বালকবালিকাদের সময় এবং শ্রম অহেতুক অনেকটা ব্যয় হইয়া যাইত। সেই সময়ের একটা ভগ্নাংশমাত্র দিলেই অনেকটা কাজ হইবে। যে শ্রেণীতে A B C D পড়ানো হইত সেই শ্রেণীতে নাগরী অ আ ক খ শিখানো অনেক সহজ। প্রাথমিক তৃতীয় চতুর্থ শ্রেণীতে একটুখানি সময় দিলেই ছেলেমেয়েদের নাগরী লিপি পড়ানো এবং লেখানো অনায়াসে শিক্ষা দেওয়া যাইবে। পূর্বেই বলিয়াছি, সপ্তম শ্রেণী হইতে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সংস্কৃত পড়ানো হয়, তখন নাগরী শিখিতেই হয়। কিন্তু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যদি লিপিশিক্ষা আরম্ভ হয় তো গোড়াপত্তনটা আরও ভাল হইতে পারে। আমার বিশ্বাস শিক্ষকসমাজ যদি সাধারণলিপি প্রচলনের আবশ্যকতা বুঝিতে পারেন তো এ কাজ তাঁহারা সানন্দে গ্রহণ করিবেন। এখন শিক্ষাবিভাগ এদিকে দৃষ্টি দিলেই হয়। প্রত্যেক প্রদেশেরই সরকারী শিক্ষাবিভাগ নূতন শিক্ষাবিধি রচনার সময় এই লিপি শেখানোর আবশ্যকতার কথা যেন স্মরণ রাখেন। অন্যান্য বিষয়ের সহিত এই সাধারণ লিপিও যেন একটি শিক্ষণীয় বিষয় বলিয়া পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত হয়।

এই সঙ্গে আর একটি কাজ করিতে পারিলে ভাল হয়। বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষার প্রসিদ্ধ পুস্তক দুই চারিখানি করিয়া নাগরীতে ছাপাইবার ব্যবস্থা করা উচিত। শখ করিয়া কেহ কেহ এ পরীক্ষা করিতে পারেন কিন্তু এ কাজ ঠিক ব্যক্তিবিশেষের কাজ নয়, প্রতিষ্ঠানেরই কাজ। বিশ্বভারতীর

কথা ধরুন। বিশ্বভারতী যদি বাঙ্গালা ভাষা যেমন আছে তেমনি রাখিয়া রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি বিখ্যাত বই নাগরী লিপিতে প্রকাশ করেন তো খুব সহজেই নাগরীলিপি প্রচারের একটা সুযোগ হয়। রবীন্দ্রসাহিত্যানুরাগী এমন অনেক অবাঙ্গালী আছেন, যাঁহারা নাগরীলিপিতে রবীন্দ্ররচনাবলী পাইলে আগ্রহের সহিত পড়িবেন। রবীন্দ্রসাহিত্য সর্বজনগম্য করিবার জন্য বিশ্বভারতী একবার এ উদ্‌যোগ করিয়াছিলেন, আর একবার করিতে পারেন। বাঙ্গালা এবং আসামের পক্ষে ইহাতে একটা লাভ হইবে। বাঙ্গালা ও আসামের অধিবাসীরা পরিচিত জিনিস পরিচিত লিপিতে পড়িবার সুযোগ পাইবেন। ইহাতে অল্পপরিচিত লিপি অতি-পরিচিত হইয়া উঠিবে।

বাঙ্গালা দেশে অনেক বড় বড় প্রকাশক আছেন। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিকতম লেখকদের রচনা পর্যন্ত যে বাঙ্গালা হইতে হিন্দীতে বহুসংখ্যায় অনূদিত হইয়াছে তাহা হয়তো তাঁহারা জানেন না। আমার বিশ্বাস, খুব জনপ্রিয় বইয়ের অনুবাদ না করিয়া শুধু লিপ্যন্তরিত করিয়া ছাপাইলেও কিছু চাহিদা পাওয়া যাইবেই। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় একাধিকবার নাগরী লিপিতে বাঙ্গালা পুস্তক মুদ্রণের আবশ্যকতার উল্লেখ করিয়াছেন, আজ নয় অনেক পূর্বেই। প্রায় তিন বৎসর পূর্বে জামসেদপুরে অনুষ্ঠিত এক সভায় সভাপতির অভিভাষণে বাঙ্গালা ভাষা প্রসারের উপায় হিসাবে তিনি বাঙ্গালা বই নাগরী লিপিতে মুদ্রণের প্রস্তাব করিয়াছিলেন, মনে হইতেছে।[1] সে প্রস্তাব কেহ কার্যে পরিণত করিয়াছেন বলিয়া জানি না।

উর্দুভাষীর সংখ্যা ভারতবর্ষে নিতান্তই অল্প ; আর্যভাষাভাষিগণের তুলনায় নগণ্য। উর্দুভাষা যাঁহারা বলেন, উর্দুহরফও তাঁহারাই ব্যবহার করেন একথা মানিয়া লইলে উর্দু লিপির ব্যবহারও সেই অনুপাতে কম, ইহা অস্বীকার করা যায় না। সমগ্র ভারতবর্ষের জন্য যখন একটা সাধারণ লিপির কথা বলিতেছি তখন অত্যল্পসংখ্যক লোকের ব্যবহৃত এই লিপির কথা তোলা আদৌ সংগত

১. ১৩৫৫ সালে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের দিল্লী অধিবেশনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির ভাষণেও তিনি এ প্রস্তাবের পুনরুল্লেখ করিয়াছেন।

কিনা তাহা বুঝিতে পারি না। তবু কথা যখন ওঠে তখন তাহা বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। অন্যান্য গুণে যদি তাহা সমৃদ্ধ হয় অপরিচয়ের দোষটা না হয় উপেক্ষা করাই যাইবে। সুতরাং সেই পথ দিয়াই অগ্রসর হওয়া যাক্।

প্রথমতঃ উর্দুলিপির উৎপত্তির ইতিহাসটা আমাদের জানা দরকার। ভারতবর্ষে উর্দুর কোনো ঐতিহ্য নাই। মোগল-পাঠানের মত ইহারাও নবাগত। মুসলমানগণের ভাষা ছিল ফারসী এবং লিপিও ছিল ফারসী। তবে তাঁহাদের ফারসী ভাষায় যেমন আরবী প্রভাব পড়িয়াছিল লিপিতেও তেমনি। সেই আরবী প্রভাবান্বিত ফারসী লিপি মুসলমানদের সঙ্গে সঙ্গেই ভারতবর্ষে আসে। এই লিপিমালার সহিত আর কিছু অক্ষর যোগ করিয়া হিন্দীভাষা লিখিবার জন্য একটা কাজচালানো লিপিমালা তৈয়ার করা হয়। ফারসী অক্ষরে হিন্দীর সকল ধ্বনি প্রকাশ করা সম্ভব নয় বলিয়া অন্য অক্ষর কিছু কিছু যোগ করা প্রয়োজন হইয়াছিল। এই লিপিমালারই নাম হয় উর্দু।

প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী এই দুইটি লিপিই প্রচলিত ছিল। কাহারও কাহারও মতে এই প্রাচীন ভারতীয় খরোষ্ঠী লিপি হইতে উর্দুর উদ্ভব। কেবল উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে খরোষ্ঠীর এবং বাকী সমস্ত অঞ্চলে ব্রাহ্মীর প্রচলন ছিল। খরোষ্ঠীলিপি আর্যলিপি নহে ইহাই পণ্ডিতদের মত। তাঁহারা বলেন সেমেটিক আরমাইক লিপির সহিতই এ লিপির সম্বন্ধ। প্রাচীনকালে ইরানীয়গণ ভারতের উত্তর-পশ্চিমের কিয়দংশ অধিকার করিয়াছিলেন। উঁহাদের লিপি ছিল আরমাইক। এই আরমাইক লিপিমালার আধারে স্থানীয় ভারতীয় ভাষার উপযোগী করিয়া নূতন কিছু অক্ষর সংযোজনপূর্বক এক লিপিমালা রচিত হইয়াছিল। এই লিপিমালা খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতক পর্যন্ত উত্তর-পশ্চিম ভারতে প্রচলিত ছিল। কিন্তু তাহার পর হইতে ঐ লিপির ব্যবহার ক্রমশঃ বন্ধ হইয়া যায় এবং উহার স্থলে ব্রাহ্মী হইতে উদ্ভূত এক বা একাধিক লিপির প্রচলন শুরু হয়। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মুসলমানদের ভারতে আগমন হয়। ঐ সঙ্গে সঙ্গে ফারসী ভাষা এবং ফারসী লিপিও আসে। তাহারই উপর উর্দুর প্রতিষ্ঠা, ভারতের পুরাতন খরোষ্ঠী লিপির সহিত ইহার কোনো ধারাবাহিক সম্বন্ধ নাই। অবশ্য একথা সত্য যে উর্দু এবং খরোষ্ঠী ইহাদের মূল এক। খরোষ্ঠী দক্ষিণ হইতে বামে লিখিত হইত, উর্দুও তাহাই

হয়। তবু ভারতীয় লিপির ইতিহাসে উর্দু অর্বাচীন, নাগরীর ন্যায় প্রাচীন নহে। সুতরাং ভাবাবেগের দিক দিয়া উর্দুর প্রতি ভারতবর্ষের আকৃষ্ট হইবার কোনো কারণ নাই।

ব্যাবহারিক সৌকর্যের দিক্ দিয়া বিচার করিলেও উর্দুর পক্ষে বলিবার কিছু থাকে না। তাহার কয়েকটি কারণ আছে। প্রধান কারণগুলি এই :

১. উর্দু যে বাল্যকাল হইতে শিক্ষা করে নাই তাহার পক্ষে এ লিপি শিক্ষা করা কঠিন এবং উর্দু লিপি বাল্যকাল হইতে শিক্ষা করে না এমন লোকের সংখ্যা ভারতবর্ষে শতকরা প্রায় চুরানব্বই। ২. শতকরা ৯৪ জন লোক সাধারণতঃ যে লিপিতে অভ্যস্ত সে লিপির সহিত ইহার কোনো যোগ নাই। কি ক্রমের দিক্ দিয়া, কি অক্ষরসংখ্যার দিক্ দিয়া, কি লিখনভঙ্গীর দিক্ দিয়া—কোনো দিক্ দিয়াই অধিকাংশ ভারতবাসীর ব্যবহৃত লিপিসমূহের সহিত উর্দুলিপির মিল নাই। অধিকাংশ ভারতবাসীর লিপি দক্ষিণমুখী, উর্দুলিপি বামমুখী। ভারতীয়েরা আজ পর্যন্ত যে রাষ্ট্রভাষা চর্চা করিয়া আসিয়াছে, তাহার লিপিও দক্ষিণমুখী বামমুখী নয়। ৩. উর্দুলিপিমালার ক্রমবিন্যাসের মধ্যে কোনো বৈজ্ঞানিক শৃঙ্খলা নাই। ৪. স্বরবর্ণের ব্যবহারে নিয়মের একান্ত অভাব।

লোকে যে লিপিতে মাতৃভাষার চর্চা করে, রাষ্ট্রলিপি যদি তাহার সগোত্র হয় তবেই সেটা শিক্ষা করা তাহার পক্ষে সহজ ও সুবিধাজনক হয়। কিন্তু উর্দুকে রাষ্ট্রলিপি করিতে গেলে তাহা হইতেই পারে না।

ইহা শিক্ষা করা কঠিন এবং অনেক ক্ষেত্রে নিষ্ফলও বটে। সমগ্র ভারতবর্ষের সাহিত্য-সম্পদ, তাহার সভ্যতা, সংস্কৃতি, শিক্ষাদীক্ষার ইতিহাস, তাহার ধ্যান-ধারণা চিন্তা ও অনুভূতির কথা যে লিপিতে রচিত আছে এই ফারসী-আরবী লিপির সহিত তাহার কোনো সংযোগই নাই। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়াই এই প্রবন্ধ শেষ করিতেছি। তিনি বলিয়াছেন :

"...it is absolutely unnecessary to force the Perso-Arabic script upon the Indian body politic as the other compulsory script for the proposed Persianised Hindi (Hindustani) as the National Language ... I would consider the time and

energy spent in acquiring that most unscientific and for the average Indian individual practically a useless script, the Perso-Arabic, to be a costly waste ...”

ইহার তৎপর্য এই :

হিন্দুস্তানী নামে হিন্দী ভাষার যে ফারসী রূপকে ভারতের রাষ্ট্রভাষা করিবার প্রস্তাব হইয়াছে তাহার জন্য ফারসী-আরবী লিপিকে অন্যতম আবশ্যিক লিপিরূপে জোর করিয়া ভারত রাষ্ট্রের উপর চাপাইয়া দেওয়া নিতান্ত অনাবশ্যক। এই লিপি শিক্ষা করিতে যে সময় এবং যে উদ্যম ব্যয় করিতে হইবে, আমার মতে তাহা সাংঘাতিক অপব্যয়। কারণ, এ লিপি একে তো কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, তাহা ছাড়া ভারতীয় জনসাধারণের পক্ষে ইহা একরকম নিরর্থক বলিলেই চলে।

শব্দগত স্পর্শদোষ

'Contamination of words'—এখানে contamination-এর বাংলা কি হবে এ নিয়ে কথা উঠেছিল। আমার প্রথমে মনে হয় যে সম্- √কৃ দিয়েই কাজ চলবে। তাই 'contamination of words' এই শব্দসমষ্টির প্রতিশব্দ দিতে চেয়েছিলুম 'শব্দসাংকর্য'। সংকর শব্দটা যেমন সাধারণ অর্থে confusion বোঝায় তেমনি এর একটা বিশেষ অর্থও আছে। সেটা হচ্ছে দুই বিভিন্ন জাতি বা শ্রেণীর মিলনে উৎপন্ন তৃতীয় এক জাতি। শব্দের ক্ষেত্রেও সংকর শব্দের এই রকম একটা সুনির্দিষ্ট বিশেষ অর্থ এসে যেতে পারে। তখন সাংকর্যের মানে দাঁড়াতে পারে দুই ভিন্ন ভাষার শব্দের একত্রীভবন। 'স্কুলপাঠ্য', 'গ্যাসালোক' প্রভৃতি শব্দকে সংকর শব্দ বলা যেতে পারে। 'Contamination' বললে যতটা বোঝাবে, 'শব্দসাংকর্য' বললে হয়তো ঠিক ততটা প্রকাশ পাবে না। এইজন্য পূজ্যপাদ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নিকট জিজ্ঞাসু হই। 'স্পর্শদোষ' শব্দটি তাঁরই দেওয়া। ভাষাতত্ত্বে 'contamination' শব্দের অর্থও যেমন ব্যাপক 'স্পর্শদোষে'র অর্থও তেমনি।

অক্সফোর্ডের স্পূনার সাহেবের সম্বন্ধে গল্প শোনা যায় যে তিনি নাকি কথা বলতে গেলেই শব্দে শব্দে গুলিয়ে ফেলতেন। তাঁর জিহ্বাটা ছিল একটু অবাধ্য রকমের। তাঁর এই অবাধ্য জিহ্বা কোনো-কোনো অসতর্ক মুহূর্তে এমনতরো এক-একটা কাণ্ড করে বসেছে যে আজকের দিনে সে-রকম একটা কিছু ঘটলে বড় সহজে নিষ্কৃতি পাওয়া যেত না। কোনো ভোজসভায় নিমন্ত্রিত হয়ে ভদ্রলোক একটি কুমারীকে অকস্মাৎ অনুরোধ করে বসলেন, "Miss, will you kindly *take me* ?" "take me" বলাটা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না, তিনি বলতে চেয়েছিলেন, "Miss, will you kindly make tea ?" তা তাঁর মনে যাই থাক না কেন প্রকাশ করে যা বলেছিলেন তার উত্তর পেয়েছিলেন এবং সে উত্তরটি তাঁর পক্ষে দুঃখের কারণ হয় নি।

শব্দের উচ্চারণক্ষেত্রে এই ধরনের ভুল আমরাও কম করি না। পাশাপাশি দুই শব্দ তাড়াতাড়ি উচ্চারণ করতে গিয়ে উদোর পিণ্ডি অনেক সময়ই বুধোর ঘাড়ে চড়িয়ে দিই—কখনও বা স্বেচ্ছায়, কখনও বা অজ্ঞাতসারে।

কিন্তু এ ধরনের জিনিস ভাষায় কখনো স্থায়ী আসন পেতে পারে না, এক কৌতুকপ্রসঙ্গ ছাড়া। খুব খানিকটা ঘুরে ফিরে এসে যার 'মুখখানি যায় শুকিয়ে' সে অনেক সময় 'এক চাপ্‌কা' খেয়ে শ্রান্তি দূর করতে পারে। কিন্তু কাগজ-কলম নিয়ে কারবার যাদের তাদের প্রয়োজন বেশী এক কাপ্ চায়েরই। হাস্য-রসের অবতারণায় এ-সব কখনো কখনো আবশ্যক হয়, তা না হলে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহপাঠীরা তাঁকে 'কশুরে জৈ' বলে জ্বালাতন করবেন কেন? বাংলায় এ-ধরনের শব্দচ্যুতি প্রায়ই দেখা যায়। ইংরেজীতে স্প্যুনার সাহেবের নামানুসারে একে স্প্যুনারিজম্ বলা হয়।

এ-ধরনের অবাধ্যতা প্রায় সকলের জিহ্বাই কখনো-না-কখনো করে থাকে কিন্তু কারও কারও জিহ্বা এত অসংযত যে প্রায়ই সীমা লঙ্ঘন করে। আমার এক বন্ধু কাপড় কদাচিৎ পরেন, 'কাপর পড়াই' তাঁর অভ্যাস। তাঁর বৈকালিক জলখাবারের মধ্যে 'সিঙারা কচুড়ি' থাকা চাই-ই।

শব্দের এমন রূপ-বিকৃতি ঘটে কেন? তার কারণ আমাদের বাগ্‌যন্ত্রটাও একটা যন্ত্র। স্প্রিঙে-চলা ঘড়ির বড় কাঁটা ও ছোট কাঁটা যেমন মধ্যে মধ্যে জড়িয়ে যায়, মনে চলা আমাদের এই বাগ্‌যন্ত্রেরও অবস্থা হয় কখনো কখনো সেই রকম। একাধিক কথা বা ভাব মনের মধ্যে জমবার অবসর পেলেই সেগুলো বেরোবার সময় ছুটোপুটি করবে, ছুটির ঘণ্টা পড়লে স্কুলের একটি মাত্র দরজা দিয়ে বেরোবার সময় ছেলেরা যেমনতরো করে। বাড়ী যাবার তাড়ায় রামের ধারাপাত যায় শ্যামের বাড়ী কিন্তু শ্যামের দ্বিতীয়ভাগখানা রামের বইয়ের মধ্যেই পাওয়া যায়। একজনের চিঠি অপরের খামের মধ্যে প্রবেশ লাভ করে কত লোকের কত অনর্থ যে ঘটিয়েছে তার হিসেব কে রাখে? এ আর কিছুই নয়, এক ধরনের অন্যমনস্কতা। দুটো ভাবের গোলমালে এই অন্যমনস্কতার সৃষ্টি। আজ যা আকস্মিক তাই আবার একদিন নিত্য হয়েও দাঁড়াতে পারে। স্পর্শদুষ্ট শব্দও তেমনি কখনো কখনো ভাষায় স্থান পেয়ে যায়।

মনস্তত্ত্বের সঙ্গে ভাষাতত্ত্বের যে অচ্ছেদ্য যোগ আছে, আধুনিক ভাষাতত্ত্ব-বিদ্‌রা সে-সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করেছেন। পলের (Paul) নাম এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন,

"We call the process 'contamination' when two

synonymous or similar sounding forms or constructions force themselves simultaneously or at least in the very closest succession, into our consciousness, so that one part of the one replaces, or it may be, ousts a corresponding part of the other; the result being that a new form arises in which some elements of the one are confused with some elements of the other."

এর তাৎপর্য এই,—যখন একার্থবোধক বা অনুরূপ ধ্বনিবিশিষ্ট দুটি শব্দ বা বাক্য যুগপৎ বা উপর্যুপরি আমাদের চৈতন্যকে অধিকার করবার জন্য উদ্যত হয়, তখন অনেক ক্ষেত্রেই এই দুইটি প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে একটির অংশ-বিশেষ অপরের অনুরূপ অংশের সঙ্গে স্থান বিনিময় করে বা ঐ অংশকে সম্পূর্ণরূপে অপহৃত করে। এই দ্বন্দ্বের ফলে উভয়ের কিয়দংশকে বিপর্যস্ত করে একটি অভিনব শব্দ বা বাক্যের উদ্ভব হয়। এই বিকৃতির প্রণালীকেই স্পর্শদোষ বলা যায়। আমরা এখানে শুধু স্পর্শদুষ্ট শব্দের কথাই আলোচনা করব।

স্পর্শদুষ্ট শব্দের জাতি হিসাব করতে গেলে স্বয়ং মনুকেও হার মানতে হবে। আমরা মোটামুটি কয়েকটা শ্রেণীতে ভাগ করে সংক্ষেপে তাদের কিছু পরিচয় দেবার চেষ্টা করব। এদের মধ্যে এক শ্রেণীর কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি, ইংরেজীতে যাকে বলে স্পূনারিজম্। স্বনামধন্য স্পূনার সাহেবের নামেই এই শ্রেণীর নামকরণ। 'কশুরে জৈ', 'সিঙারা কচুড়ি' প্রভৃতি বাংলার স্পূনারিজম্।

দ্বিতীয় শ্রেণীর স্পর্শদুষ্ট শব্দের উদাহরণ হবে মনোরথ। মনোরথ শব্দটা বাংলায় তো চলবেই কেন-না সংস্কৃতেও ওটা চলে। এর স্পর্শদোষটা ঘটেছে সংস্কৃত থেকেই, বাংলায় এসে নয়। আসল শব্দটা ছিল 'মনোহর্থ'। অপরিচয়ের ফলে শব্দটা আমাদের নূতন ঠেকবে হয়তো। মনোহর্থ (মনঃ + অর্থ) মনের উদ্দেশ্য বা অভিলাষ। একদা মনোরথ অধিকার করে বসল মনোহর্থের স্থান। তাই মনোরথ সিদ্ধ হোক্ প্রভৃতি প্রয়োগ ভাষায় চলে গেলেও বিশ্লেষণ করে দেখতে গেলে গোলমাল ঠেকে। সেই জন্যেই কারও কারও 'মনোরথ' সিদ্ধ না হয়ে পূর্ণ হয়।[১]

১. কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করি যে মনোরথ শব্দটির উৎপত্তির ইতিহাস প্রথম শুনি আমার অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ের মুখে।

এ-রকম স্পর্শদুষ্টি ঘটে কেন? কারণ, পদ বা পদাংশ পরিবর্তিত হয়ে কখনো কখনো নব নব রূপ ধারণ করে, যদি পূর্ব ও পরিবর্তিত শব্দের মধ্যে বেশ একটা ধ্বনিগত সাম্য থাকে। কিন্তু শুধু ধ্বনির মিল নয়, অর্থেরও মিল কিছু থাকা চাই। এখানে মনোরথ অর্থের দিক্‌ দিয়ে মনোঽর্থের কাজ স্বচ্ছন্দে চালিয়ে নিচ্ছে, অন্ততঃ তার অযোগ্যতা সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন ওঠেনি। আর এদিকে উচ্চারণের মিল তো আছেই। স্পর্শদুষ্ট হলেও ভাষার ক্ষেত্রে এঁরা একেবারে অনাচরণীয় নন।

ধ্বনিসাম্যের ফলে আর এক রকম স্পর্শদোষের উদ্ভব হয়, কিন্তু এগুলি কৌতুকপ্রসঙ্গ ছাড়া ভাষায় অল্পই ব্যবহৃত হয়। ছোট ছেলেরা কখনো কখনো এ-ধরনের শব্দ ব্যবহার করে বসে কিন্তু তার জন্যে শাস্তিও পেতে হয়। 'protractor' ব্যতীত 'protector' দিয়ে যে জ্যামিতির চিত্র আঁকা যায় না 'mathematic'এর শিক্ষক মহাশয়ের বেত্রদণ্ড তা বারংবার বুঝিয়ে দেয়। আমরা ঠাট্টার ছলে মাতালের নামানুসারে চা-খোরকে 'চাতাল' বলি। জনৈক অভিভাবক সেদিন কোনো অধ্যাপককে বলছিলেন যে তাঁর পুত্র ইংরেজীতে একটু 'deficit,' ছেলেবেলা থেকে নিজে তো পড়ানোর সময় পান নি। কাঠের ও টিনের মিস্ত্রিরা 'রিপিট' (rivet) করে কাঠ বা টিন জুড়ে। মিস্ত্রি-সমাজে 'রিপিট' কথাটা খুব চলে গেছে। 'ডায়মন' (diamond) কাটা বাজু ও 'পায়নাফুলি' (pine-apple) শাড়ি স্কুল-কলেজে-পড়া মেয়েরাও মাঝে মাঝে পরে থাকেন। নবোদ্ভাবিত 'পিটুনি' পুলিস খবরের কাগজ মারফত দেখছি বাংলার পল্লীগ্রামেও বাসা বাঁধল। 'মার্লসি' (M. L. C.) ও তাই। এটা বোধ হয় এম্. এল্. সি. ও মামলা এই দুটো শব্দের ধ্বনিসহযোগে গঠিত।

অজ্ঞতা, উপেক্ষা বা অনবধানতা হেতু ব্যাকরণের নিয়ম উল্লঙ্ঘন শব্দ-বিপর্যয়ের আর একটি কারণ। লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকদের রচনাতেও এই ধরনের বিপর্যস্ত শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। স্বাধীনচেতা মধুসূদন কেবল শ্রুতিমধুর হবে বলে বরুণানী না লিখে বারুণী লিখেছিলেন। মনে মনে আশঙ্কা নিশ্চয় ছিল চলবে কি না। বারুণী শব্দটার সঙ্গে পূর্বপরিচয়ই এখানে স্পর্শ-দোষ সংঘটন করেছে, এই রকম অনুমান হয়। শরৎচন্দ্র 'লইয়াছি'র স্থানে 'নিয়াছি' লেখেন, 'দিয়াছি'র প্রভাবে সম্ভবতঃ। এটাকে analogyর উদাহরণ বলা চলতে পারে। ভাষার নিয়মানুমোদিত না হলেও নিয়াছি-টা চলে

গেছে। অনেক লেখকই আজকাল নিয়াছি লিখছেন। কেউ কেউ গাইতে-র স্থলে 'গেতে'ও ব্যবহার করছেন।

একার্থবোধক শব্দ ও প্রত্যয়াদির যোগে প্রায়ই পুনরুক্তির সৃষ্টি হয়, কারণ যা উক্ত তাও অনেক সময় অনুক্ত বলেই প্রতিভাত হয়। 'অত্তাপিও' (অত্ত+অপি+ও) র 'অপি' এবং 'ও' এই দুইটি অব্যয়ই একার্থবাচক, কিন্তু 'অত্তাপিও' ব্যবহার করেন যাঁরা, তাঁদের মন অত্তাপির অর্থ 'অত্ত'র চেয়ে কিছু বেশী বলে গ্রহণ করে না। ধরে দিলে বলবেন—ও তাই তো! 'আয়ত্তাধীন' 'কিয়ৎ-পরিমাণ' 'কেবলমাত্র' প্রভৃতি শব্দও এই শ্রেণীতে পড়ে। 'উদ্বেলিত', 'অধীনস্থ', 'সশঙ্কিত', 'নিঃশেষিত' প্রভৃতি শব্দকেও এই শ্রেণীরই অন্তর্গত করা যায়। উপরের শব্দগুলিতে যে প্রত্যয়গুলি যোগ করা হয়েছে সেগুলি সম্পূর্ণ 'অনাবশ্যকীয়'। 'অধীনস্থ' শব্দটি fallen vacant under your kind disposal স্মরণ করিয়ে দেয়। এ-রকম ভুল বাঙালীর মুখে ও হাতে প্রায়ই বেরোয়। আমরা যখন যার 'underএ' কাজ করি তখন তার। আবার তার কাছে থেকে চলে গেলে তারই 'againstএ' জটলা পাকাই। ইংরেজী pre-position-এর গায়ে বাংলা post-position-এর হরিহর রূপ। ব্যাকরণের ধর্মাধিকরণে এই অপরাধ দণ্ডবিধির আমলে আসতে পারে কিন্তু 'সৌজন্যতা'-বোধে এ-সবও উপেক্ষা করা হয়ে থাকে। দেখা যায় 'নিরপরাধী' ও 'নির্বিরোধী' লোকই বেশীর ভাগ ধরা পড়ে। 'অংশীদার' 'ভাগীদার' জ্ঞাতি 'সাবধানী' লোককেও 'সদাসর্বদা' ফাঁকি দেয়। 'গুরুতর' কথার সময়ও আমরা গাম্ভীর্য রক্ষা করতে পারি না। শ্রেষ্ঠকেই যখন মর্যাদা দিই তখন 'শ্রেষ্ঠতমকে' অবজ্ঞা করি কেমন করে? ইংরেজীতেও innermost প্রভৃতি শব্দ পাওয়া যায়।

বিদেশী শব্দ বাংলায় এসে যখন জাত হারায় তখন তার যে রূপ হয় সেটি ভারী মজার। সে-রকম স্পর্শদুষ্ট শব্দের কয়েকটি উদাহরণ আগে দিয়েছি, এখানে আরও কয়েকটি দিচ্ছি। 'নাবালক' কথাটি ফারসী নাবালিগ্ শব্দের বাংলা রূপান্তর। বালিগ্ শব্দটা একে অপরিচিত, তাতে আবার বালক শব্দের সঙ্গে ধ্বনির মিল আছে। সুতরাং না-বালিগ্ দাঁড়াল 'নাবালক' হয়ে, যদিও শব্দের আকৃতি ও অর্থ হয়ে গেল পরস্পর-বিরুদ্ধ। অবশ্য 'অমন্দ'র নজিরে 'না' স্বার্থে প্রযুক্ত বলতে পারি। 'নাবালকের' দেখাদেখি 'সাবালক'।

এই প্রসঙ্গে 'লালটিন' কথাটা উল্লেখযোগ্য। লণ্ঠন (lantern) কে পশ্চিমবঙ্গের কোনো কোনো জেলায় এবং উড়িষ্যা অঞ্চলে 'লালটিন' বলে। লণ্ঠনটা তৈরি হয় সাধারণতঃ টিনে তাই (tern>) ঠন টার স্থান সহজেই অধিকৃত হল 'টিন' দ্বারা এবং নিরর্থক লন শব্দটার জায়গায় এসে বসল 'লাল'। লাল শব্দটার সার্থকতাও হয়তো কিছু ছিল। এদেশে যখন হারিকেন লণ্ঠন প্রথম আমদানি হয় তখন টিন ও পিতল উভয় ধাতুরই লণ্ঠন আসত। আজকাল পিতলের লণ্ঠন খুব কম দেখা যায়। পিতলের রংটার সঙ্গে লাল শব্দটার যোগ থাকা অসম্ভব নয়। কিন্তু মজা হচ্ছে এই যে একই লণ্ঠন 'লাল' এবং 'টিন' দুই-ই হতে পারে না। 'লালটিন' শব্দটি স্পর্শদোষের একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত।

আর এক রকম শব্দের কথা বলে এই প্রবন্ধ শেষ করব। ইংরেজীতে এই ধরনের স্পর্শদুষ্ট শব্দকে বলে portmanteau words। উদাহরণ দিলে এটা সহজে বোঝা যাবে। প্রথমে একটা ইংরেজী শব্দই বলি। potatomato শব্দটি নূতন বেরিয়েছে। ওদেশের কোনো উদ্ভিদ্‌তাত্ত্বিক আলু ও বিলাতিবেগুন মিলিয়ে এক অভিনব ফল তৈরি করেছেন। তারই নাম দিয়েছেন potatomato। বাংলা রূপকথাটি সম্ভবত এই রকমের রূপক ও কথা এই দুইটি শব্দ সহযোগে গঠিত। উত্তরায়ণ সংক্রান্তিকে 'উত্তরান্তি' বলতেও শোনা যায়। একটি দোকানের নাম দেখলাম 'বিশ্বাম্বর' (বিশ্বম্ভর+অম্বর) স্টোর্স। আর একটি খাবারের দোকানের 'বিশালক্ষ্মী' মিষ্টান্নভাণ্ডার এই নাম দেখেছি। বিশালক্ষ্মীর আসল রূপ যে বিশালাক্ষী তাতে সন্দেহ নেই। তবে তার সঙ্গে যোগ হয়েছে লক্ষ্মীর। আমাদের টালিগঞ্জ আর আমেরিকার হলিউড মিল 'টলিউড' হয়েছে। এই প্রসঙ্গে ওড়িয়া 'প্রাকর্ম' শব্দটির কথা মনে পড়ে। প্রাচীন ওড়িয়ার পরাক্রম শব্দটি বানান ভুল করে 'প্রাকর্ম' লেখা হত। বানানের সঙ্গে মানেও গেল বদলে। নূতন শব্দের নূতন মানে হল অদৃষ্ট। এই শব্দটি দেখলে মনে হয় স্পর্শদোষ ঘটেছে প্রাক্তন ও কর্ম—এই দুই শব্দের মধ্যে। লক্ষ্য করলে এ-রকম অনেক কথাই নজরে পড়ে।